# পরিবেশ ও নগরজীবন

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

# পরিবেশ ও নগর জীবন

বই মেলা
২০০১

# পরিবেশ
# ও
# নগর জীবন

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

## সূচিপত্র

এই নগর সেই দিনে ৭
দোলাই-বুড়িগঙ্গার প্রবাহে ১০
নদীকে ধোবে কে? ১৩
শ্বাসরুদ্ধ নদী ১৫
পানির উৎস ১৮
ভূ-গর্ভের পানি : আরো সমস্যা ২০
ভূ-তলের পানিতে দূষণ ২২
আবদ্ধ পানি, বিপর্যস্ত নাগরিক ২৪
তারপর বন্যা ২৬
এ কী রকম বাতাস? ২৮
অপরাধী গাড়ি ৩১
গাড়ি নিয়ে কি করি ৩৩
ফুসফুস এখন যার দখলে ৩৬
এসিড পড়ে টাপুর টুপুর ৩৯
প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনিং ৪২
বিষ নিয়ে বাস ৪৪
পরিবেশে পারদ বিষ ৪৬
বালাই নাশের বালাই ৪৯
যা হিসাবে আসে না ৫২
তেল-কয়লার কালিমা ৫৪
দক্ষ জ্বালানি, মুক্ত বায়ু ৫৭
ভবিষ্যতের জ্বালানি ৫৯
শক্তির আরো কিছু উৎস ৬১
জ্বালানির বিষয়ে সহজ বুদ্ধি ৬৪
প্রশ্ন এখন উঠছে ৬৬
সৌর বিদ্যুতের হাতছানি ৬৮

বায়ুকলের নূতন ভবিষ্যৎ ৭১
উন্নয়ন ও জ্বালানি ব্যবহার ৭৪
লাঠি না ভেঙে সাপ মারা ৭৬
তেজস্ক্রিয়তা আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা ৭৯
পারমাণবিক শক্তির বিপত্তি ৮১
তেজস্ক্রিয়তার হুমকি ৮৩
পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে ৮৫
কার্বন নিয়ে সমঝোতা ৮৭
থলে না নিয়েই বাজারে ৮৯
শিশি বোতল পুরনো কাগজ ৯৩
জঞ্জালের শেষ গতি ৯৫
মাটিতেই যেন মিশে যায় ৯৮
কার দোষ কতখানি ১০০
আবর্জনার ব্যবহার ১০২
পুনর্ব্যবহারের আরো কথা ১০৪
বর্জ্যের উপর জীবাণুর কাজ ১০৭
নিরাপদ খাবার ১০৯
পরিবেশ থেকে খাদ্যে ১১১
খাদ্যের উপর কারিগরি ১১৩
কোন খাবারে কি? ১১৫
ভাল জীবাণুর কথা ১১৭
নিরুপদ্রব প্রকৃতি ১১৯
নগররূপী দ্বীপ ১২১
এজেন্ডা-২১ : সুস্থ কৃষি ১২৩
জিন-কারিগরির নতুন কৃষি বিপ্লব ১২৬
সবুজের সংকেত ১২৮
বিপর্যয়টির হোতা আমরাই ১৩০
পরিবেশের জন্য আন্দোলন ১৩৩
চিপকো : তৃণমূলে প্রতিরোধ ১৩৬
সনাতন ও উন্নত প্রযুক্তি ১৩৮
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে ১৪০
নগর মানে কোলাহল ১৪৩
সেই উদ্যান নগরী ১৪৬
উচ্চ বায়ুস্তরের কথা ১৪৯
পরিবেশের বিশ্বায়ন ১৫১

# এই নগর সেই দিনে

পরিবেশ নিয়ে দুনিয়ার অনেকেই আজ খুব ভাবছে। জাতিসংঘ যে এ বছরটিকে পরিবেশ সংরক্ষণের বছর ঘোষণা করেছে সে এই ভাবনারই একটি প্রকাশ। পরিবেশের কথা যখন ওঠে তখন আমাদের এই বিশ্বটিকে একটি অখণ্ড সত্তা হিসাবে ভাবতে হয়—একই বায়ুমণ্ডলে বিশ্বের সবাইকে নিঃশ্বাস নিতে হয়, একই জলরাশি দ্বারা সবাই প্রভাবান্বিত। দুনিয়ার অনেকেই নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আরো হবে। পরিবেশ দূষণের এমন সব খারাপ খবর আমরা পাচ্ছি। এই যেমন গ্রীন হাউজ এফেক্টের কথাই ধরা যাক। অবিবেচকের মত যে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের মত গ্যাস আমরা বায়ুমণ্ডলে ছাড়ছি তার আবরণ সৌর কিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীর তাপকে জমিয়ে রাখছে, মহাশূন্যে ঠিক মত বিকীর্ণ হতে দিচ্ছে না। ফলে একটু একটু করে উত্তাপ যাচ্ছে বেড়ে। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে জলবায়ুর উপর, সমুদ্রতল উঁচু হচ্ছে, বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের মত বিস্তীর্ণ ভূমি সাগর তলে চলে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

অবাঞ্ছিত এ রকম আরো বর্জ্য গ্যাস আমরা বায়ুমণ্ডলে যেতে দিচ্ছি যার কোন কোনটা ফুটো করে দিচ্ছে উর্ধ্বাকাশের ওজোন স্তর—আমাদের বঞ্চিত করছে ক্ষতিকর রশ্মির হাত থেকে, বাঁচার জন্য ওজোনের নিরাপত্তা বেষ্টনী থেকে, অসহায় হয়ে পড়ছে আমাদের পৃথিবী।

অপেক্ষাকৃত তাৎক্ষণিক দূষণগুলোও আনতে পারে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া। চেরনোবিলে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে দুর্ঘটনা ঘটলো—আর তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতে বিপর্যস্ত হলো ইউরোপের বিশাল অঞ্চলে প্রাণী জীবন, কৃষি ব্যবস্থা। দূষিত গুঁড়ো দুধ এসে আতংকিত করে তোলে বাংলাদেশের শিশুর বাবা-মাকে। এখন তাই শুধু এই লোকালয় বা ঐ লোকালয়ের পরিবেশ নিয়ে ভাবলেই চলবে না, ভাবতে হচ্ছে সারা দুনিয়ার সব জায়গায় কি হচ্ছে, কি ঘটছে সেই সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা।

কিন্তু বিষয়টিকে আরো এক ভাবে দেখা যায়, দেখা উচিত। তা হলো যার যার নিজের লোকালয়ের পরিবেশের দিকে তাকানো। আসলে প্রত্যেকটি লোকালয় কিভাবে পরিবেশকে বজায় রাখছে তার উপরই নির্ভর করে বিশ্ব পরিবেশ—উভয়ে একেবারেই এক সূত্রে গাঁথা। তা ছাড়া নিজের পারিপার্শ্বিকতার অবস্থা মানুষের জীবনের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে জীবন-যাত্রায় মানের কথা বলা যায় না, সত্যিকার উন্নয়নের কথাও নয়। আমার বসত, আমার আঙ্গিনা, যে লোকালয়ে আমার বিচরণ, তার পরিবেশের ভালমন্দের দায় আমাকেই বহন করতে হবে বৈ-কি।

অপেক্ষাকৃত অল্প জায়গার মধ্যে নব্বই লক্ষ লোকের বসত আমাদের ঢাকা মহানগর। অন্যান্য বড় নগরীগুলোতেও কম যায় না। গ্রামের পরিবেশ সমস্যা অপেক্ষাকৃত ভিন্ন প্রকৃতির হলেও, মোটেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পরিবেশ আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলবে, সচেতন প্রয়াসে রাখবে এটিই তো স্বাভাবিক।

এ রকম ভাবনা মানুষের শুধু আজকের নয়, এটি সভ্যতারই সমবয়সী। বিস্তীর্ণ ভূ ভাগে অল্প কয়েক জন গুহাবাসী মানুষ যখন এ-গুহায় ও-গুহায় বাস করেছে তখন তাদের কাছে পরিবেশ দূষণের সমস্যা প্রকট ছিল না। আসলে সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের শুরু থেকে, বিশেষ করে নগর জীবনের শুরু থেকেই পরিবেশের বিষয়টি মানুষকে ভাবতে হয়েছে। আমাদের এই ঢাকায় হয়তো-বা পাঁচশ' বছর আগে যখন নগর জীবন দানা বেঁধে উঠছিল তখনই এ প্রশ্ন এখানে দেখা দিতে শুরু করেছিল। ইতিহাসের সব পর্যায়ে এ সমস্যা ছিল, থাকবে। আজ সমস্যা বড় হয়েছে, পুঞ্জীভূত হয়েছে যুগ-যুগের অমনোযোগের ফলে; তাই আমাদেরকে সাবধান হতে হচ্ছে বেশি। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদেরকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করছে, সতর্ক করছে ভবিষ্যতের বিপদ আশংকা সম্পর্কে। আজ যে আমরা সাবধানী হব এটিও তার একটি কারণ।

সুবাদার ইসলাম খাঁ ১৬০৮ সালের যে দিনটিতে বুড়িগঙ্গা পারের এই জনপদটিকে মুগল সুবার রাজধানী নির্বাচিত করেছিলেন সেদিন অন্য সবকিছুর সঙ্গে পরিবেশের বিষয়টি তাঁকেও ভাবতে হয়েছিল। প্রাকৃতিক জলধারার আঁকাবাঁকা খাল খনন করিয়ে যে দোলাই খালকে তিনি খনন করিয়েছিলেন সেটি প্রধান জলধারার গৌরবে শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গায় পড়তো। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল শহরের নানা অঞ্চলের আরো ছোট ছোট বহু খাল। নৌ-যোগাযোগ যেমন এসব জলধারার একটি কাজ ছিল, তেমনি ময়লা নিষ্কাশনের মাধ্যমে শহরের পরিবেশ সংরক্ষণ ছিল আর একটি উদ্দেশ্য। সেদিন সমস্যা বড় হয়ে ওঠেনি। স্বল্প বসতির ছোট শহরটি এ সব জলধারা ধৌত হয়ে হয়তো বেশ ছিমছামই থাকতে পারতো।

নগর সভ্যতায় ঘনবসতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষার জন্য কিভাবে উদ্যোগী হতে হয় তার চমৎকার উদাহরণ রেখে গেছেন পুরবাসীরা এরও বহু বহু দিন আগে সিন্ধু অববাহিকায় হরপ্পায় আর মহেঞ্জোদারোতে। খ্রিস্টপূর্ব ২,৫০০ অব্দে এখানেই বোধ হয় নগরীর বর্জ্য নিষ্কাশনের সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহেঞ্জোদারোর বাড়িতে ছিল নর্দমা যা যুক্ত ছিল রাস্তার নিচের বৃহৎ নর্দমার সঙ্গে এবং অবশেষে নিষ্কাশন হ্রদে। খাবার পানি যেন ভাল হয় সে জন্য ঘরে ঘরে পানি পৌঁছাবার পদ্ধতিও গড়ো উঠেছিল এখানে। পরে মিশরে, ক্রীটে, গ্রীসে এবং সর্বোপরি রোমান নগরীগুলোতে। বিশেষ করে রোমানরা নগরের সুপরিবেশ রাখার কাজটিকে তাদের প্রকৌশল দক্ষতার অন্যতম প্রকাশ হিসাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তৈরি রোমের ক্লোয়াকা ম্যাক্সিমা অর্থাৎ সম্মিলিত নিষ্কাশন নর্দমা সাড়ে দশ

ফুট চওড়া আর ১৪ ফুট উঁচু আর এর উপরটা এবং আগাগোড়া পাথরের ব্লকে আচ্ছাদিত। ময়লা পানি টাইবার নদীতে নিয়ে ফেলার এই সুবৃহৎ নর্দমা এতই ভালভাবে নির্মিত যে আজও তা ব্যবহারোপযোগী রয়ে গেছে, ব্যবহার হচ্ছেও।

তবে সমস্যাটি সেখানেও বড় হয়ে দেখা দেয়নি, না মহেঞ্জোদারোতে, না সীজার শাসিত রোমে, না ইসলাম খাঁ শাসিত ঢাকায়। সমস্যা প্রকট হয় জনবসতির ঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। মুগল রাজধানী হবার এক শ' বছরের মধ্যে ঢাকা যখন পরিণত হলো মসলিন খ্যাত শিল্প নগরীতে, তারও পরে লোকসংখ্যা যখন গিয়ে পৌঁছল প্রায় দশ লক্ষে, সমস্ত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও পরিবেশের সমস্যাও তখন ছাড়িয়ে গেল সব মাত্রা। সুবিস্তৃত খালগুলোও তখন ব্যর্থ হতে শুরু করলো শহরকে পরিষ্কার রাখতে। রাস্তা-ঘাট গিঞ্জি, নৌকা ছাড়া যানবাহন কিছু নেই বললেই চলে। এই বিশাল জনসংখ্যার অধিকাংশই চাইলো নদীর ধার ঘেঁষে বাস করতে। কাজেই শহরটি দৈর্ঘ্যেই শুধু বাড়লো, বিস্তার পেলো না। অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র—মসলিনের কলা-কুশলীরাও। বহু ইমারত অট্টালিকা সত্ত্বেও এদের প্রায় সবাই থাকত অত্যন্ত ঠুনকো ঘর বাড়িতে—পর্যটক তাভ্যার্নিয়েরের মতে যা বাঁশখড়ের কুঁড়ে ছাড়া কিছু নয়। আবর্জনা নিষ্কাশনের অভাব শহরকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতো যে মাঝে মাঝে বাজারের এক এক অংশকে ইচ্ছে করেই পুড়িয়ে দিতে হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সময়ে পরিবেশের দুর্ভোগ যে শুধু ঢাকারই ছিল তাও নয়। আরো বড় শহর সমসাময়িক লন্ডনেই-বা আমরা কি দেখি। ত্রিশ লক্ষ লোকের এই শহরের সমস্ত বর্জ্য পদার্থের সমাবেশ ঘটতো শহরের ঠিক মাঝখানের খোলা ডোবায়। গরমের দিনগুলোতে এর দুর্গন্ধ মানুষের সহ্য শক্তির বাইরে চলে যেত। এই কারণে পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু পরিবেশের অবনতির আর একটি দিক তখন সবে আত্মপ্রকাশ করেছে মাত্র। সেটির মূলে পরিবেশ সচেতনতাহীন শিল্প বিপ্লব। যার খেসারত আজ কম-বেশি দিতে হচ্ছে সেই সব দেশে. এবং এক ভাবে, কখনো বা প্রকটতরভাবে আমাদের এই মহানগরীতেও।

# দোলাই-বুড়িগঙ্গার প্রবাহে

গোড়াতে এই মহানগরীর পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত বর্তিয়েছিল এর খাল নদীর উপর—বুড়িগঙ্গা, দোলাই ও অন্যান্য ছোট ছোট খাল। পরে এক পর্যায়ে নগরে পরিবেশের অবক্ষয়ক্রিয়া যখন চরমে এসেছিল তখন তার মূর্তি ভাল বোঝা যেত এ সব খালের করুণ অবস্থা দেখলে। জলাধারকে জলাশয়কে মানুষ মনে করে সর্বংসহা—যা কিছুই এর মধ্যে ফেলবো সবই সে হজম করে ফেলবে, যতই কুশ্রীতা দিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করি না কেন সে তা দূর করে দিয়ে নিজের টলোটলো রূপ বজায় রাখবে। কিন্তু এমনটি তো আর হবার নয়। আমাদের দূষণ সৃষ্টি ক্রিয়ার বেশি ছাপ গিয়ে পড়ে নগরীর জলাশয় ও জলাধারগুলোতেই; কারণ অধিকাংশ দূষণের ওখানেই শেষ আশ্রয়। আর পানি, যাকে জীবন বলে জানি, সেই যখন বেঁকে বসে তখন নগরবাসী যায় কোথায়।

নগর সভ্যতার পুরো ইতিহাস জুড়েই পানির সমস্যাটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ফ্রনটিনাসের লেখা সমসাময়িক বিবরণী থেকে আমরা দেখি প্রথম খ্রিস্টাব্দের রোমে আটটি আকুয়াডাক্ট অর্থাৎ জলনালী প্রতিদিন বিশ কোটি গ্যালন পানি নগরের ব্যবহারের জন্য বাইরে থেকে নিয়ে আসতো। এটি নগরের সর্বত্র অনেকগুলো ফোয়ারায় এবং জল-কলে সবার জন্য দেদার ভাল পানির যোগান দিত। ইউরোপের সর্বত্র রোমান আমলে নির্মিত বহু আকুয়াডাক্ট এখনো যে শুধু দেখা যায় তাই নয়, এর কিছু কিছু এখনো ব্যবহৃতও হয়। অথচ সব তরল বর্জ্য টাইবার নদীতে গিয়ে পড়ত বলে এই রোমেই এক সময় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে অনেকে মনে করেন এটা রোমান সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে ভূমিকা রেখেছে। আমাদের ঢাকার মত ঘনবসতিপূর্ণ অথচ সীমিত সম্পদের নগরীতে পানির দূষণ সামগ্রিক পরিবেশকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম—সে আর বিচিত্র কি?

সারা নগরের মানব বর্জ্য, অন্যান্য প্রাণী বর্জ্য ও যাবতীয় তরল এমনকি অতরল আবর্জনা নর্দমা ও পয়োপ্রণালী হয়ে শেষ পর্যন্ত জলাশয়ে গড়াচ্ছে। তার উপর সভ্যতার আনুষঙ্গিক হিসাবে কালে কালে জীবন-যাত্রা ও উৎপাদন ব্যবস্থা দূষণের নতুন নতুন অনেক উৎস যোগ করেছে যেগুলো সম্বন্ধে পরিবেশগতভাবে সচেতনতার অভাব যা নগরজীবনের মানে দারুণ অবনতি ঘটাতে সক্ষম।

পয়োপ্রণালী মাধ্যমে যেসব বর্জ্য আসে সেগুলোকে জলাশয়ে ফেলার আগে বিস্তারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্দোষ করে নেবার রীতি উন্নত দেশসমূহে রয়েছে। আমরা পানিকেই সর্বংসহা ধরে নিয়ে পুরো কাজটিই তার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। পানি অবশ্য সে কাজ কিছুটা যে পারে না তা নয়। এটি ঘটে কিছু জীবাণুর মাধ্যমে যা অক্সিজেনের সহায়তায় বর্জ্যকে অবক্ষয়িত করে প্রায় নির্দোষ জিনিসে পরিণত করতে পারে। এগুলোকে বলা হয় এরোবিক বা বায়ুনির্ভর জীবাণু। বর্জ্যের উপর এদের কাজের ফলে আবর্জনা পরিণত হয় উদ্ভিদের সারে—নাইট্রেট, সালফেট, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদিতে। বর্জ্যের আগমনে জলাশয়ের পানি তাই ক্ষুদ্র আলজি ধরনের উদ্ভিদের জন্য বেশ যুৎসই হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ওখানে এমনিতেও যেসব প্রাকৃতিক বর্জ্য জমছে—যেমন মরা মাছ, ডালপাতা পচা সেসবও সার হয়ে সেই ক্ষুদ্র উদ্ভিদের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলে।

পানিতে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে ক্ষুদ্র সব প্রাণী যাদেরকে এক কথায় জুপ্লাংকটন বলা হয়। সেগুলো খায় ছোট মাছে। বড় মাছ আবার ছোট মাছ খায়—এমনি করেই এ সব জলাশয় বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সুস্থ প্রক্রিয়াও বটে। এভাবেই আমাদের জলাশয়গুলো নির্দোষ থাকে, জলজ জীবের জন্য স্বাস্থ্যকর থাকে এবং আমাদের জন্য সুন্দর থাকে।

মুশকিল বাধে যখন জলাশয়ের উপর বর্জ্যের অতিরিক্ত চাপ পড়ে বিশেষ করে অশোধিত বর্জ্যের। ঐ সুস্থিত চক্রটি তখন একেবারে ভণ্ডুল হয়ে পড়ে পরিবেশে অবনতি দেখা দেয়, সীমিত পানিতে মাত্রাতিরিক্ত কাঁচা বর্জ্য পদার্থ গিয়ে পড়লে সেখানে এরোবিক জীবাণুর কাজ দারুণ বেড়ে যায়। পানির মধ্যে যেটুকু অক্সিজেন দ্রবীভূত ছিল তা বিপুল পরিমাণ বর্জ্যে থেকে প্রচুর সার তৈরি হতে থাকে বলে অনিয়ন্ত্রিত আলজি শৈবালে জলাশয় থক থক্ করতে থাকে। কিন্তু অক্সিজেন বিহীন পানিতে এ শৈবাল কারো ভোগে তো লাগেই না বরং শিগ্‌গির এগুলো পচে আবর্জনার চাপ আরো বাড়ায়। জলাশয় এভাবে দ্রুত মৃতপুরী হবার দিকে এগিয়ে চলে। যা হবার কথা ছিল নগরবাসীর জন্য শাপলা পুকুর, সুন্দর লেক ঝিল, কিংবা উচ্ছল খাল নদী তা হয়ে পড়ে এঁদো-ডোবা কিংবা নোংরা জলধারা।

পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন যখন একেবারেই ফুরিয়ে যায়, ঐ এরোবিক জীবাণু তখন আর কাজ করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে অন্য একদল জীবাণুর। এনেরোবিক জীবাণু নামে পরিচিত এরা বাতাসের সাহায্য ছাড়াই কাজ করে। এরাও বর্জ্যকে অবক্ষয়িত করে, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় দুর্গন্ধময়, পরিবেশ দূষণকারী কিছু গ্যাস উৎপন্ন করে। এমন জলাশয়ের পানি ব্যবহার করতে পারা দূরে থাক এর আশপাশে অবস্থান করাই তখন দায় হয়।

বোঝা যাচ্ছে দূষণের চাপে পানির অক্সিজেন কি হারে ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে সেটি একটি জরুরী খবর। কোন্ পানিতে বর্জ্যের ঘনত্ব কিভাবে জমেছে তা জানার জন্য এর কিছু নমুনা এনে পরীক্ষা করা যায় এতে অক্সিজেন কি হারে কমছে। এ হারকে বলা হয় জৈব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা। যে পানিতে এ চাহিদা যত বেশি সে পানির দূষণও তত বেশি।

এমনিভাবে যদি দূষিত হতে থাকে আমাদের জলাশয়গুলো, জল ধারাগুলো, তাহলে এত বড় একটি মহানগরী কোথায় পাবে তার ব্যবহার্য পানির উৎস, গিঞ্জি আবাসে স্নিগ্ধতা সৃষ্টির উপাদান কিংবা বেড়াবার জন্য পানির ধার। তারপর যদি প্রশ্ন উঠে ঢাকার নগর জীবনের চির জ্বালাতন মশার আবাস কোথায় তাহলেও তো একই উত্তর—ঐ নষ্ট পানি। এর উপর ওষুধ ছিটিয়ে মশাকে আপাতত দমন করা যায়, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুও ধ্বংস করা যায়—কিন্তু দূষিত পানির সব বিষক্রিয়া তাতে দূর হয় না, পরিবেশের সব সুস্থতাও ফিরে আসে না।

অসংখ্য মানুষের জীবন যুদ্ধের স্থল এই নগরী—বহু শিল্প, বহু কর্মকাণ্ড এর সর্বত্র, অলিতে গলিতে। যারা এগুলো চালাচ্ছে, যারা এতে কাজ করছে সবাই পরিবেশকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। এ সব কাজের ফলে নর্দমায়, জলাশয়ে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকছে নানা অবাঞ্ছিত রাসায়নিক দ্রব্য। সীসা, পারদ, আর্সেনিক প্রভৃতি বিষময় জিনিসও এর মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। খুব স্বল্প পরিমাণেও যদি এ সব আমাদের পানীয়তে, খাবারে গিয়ে ঢোকার সুযোগ পায় তাহলে দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ে মারাত্মক পরিণতি অবধারিত।

আবার এমন অনেক সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসও আপাতদৃষ্টিতে থাকে যা বেশ নির্দোষ মনে হয়, কিন্তু বর্জ্য হিসেবে পানিতে গিয়ে যথেষ্ট বিপত্তির কারণ হতে পারে। এই যেমন ধোয়া মোছার জন্য ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের কথাই ধরা যাক। সাধারণভাবে আমরা অবশ্য ধোয়ার সাবানই অধিক ব্যবহৃত করছি এখনো। কিন্তু নগরে ডিটারজেন্টের ব্যবহার ক্রমে বাড়ছে, বাড়ির ব্যবহার ছাড়াও শিল্পে ধোয়া মোছার কাজেও। এটিই স্বাভাবিক এবং এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। পানিতে খরতা থাকলে সাবানের ফেনা হতে চায় না, ডিটারজেন্টের সে অসুবিধা নেই। এ গুণটি ডিটারজেন্ট পেয়েছে তাতে থাকা ফসফেট থেকে। কিন্তু সারা শহরের বহু গোসলখানা, লন্ড্রি শিল্প কারখানা থেকে ধোয়ার পানির সঙ্গে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের এই ফসফেট যখন জলাশয়ে গিয়ে পড়ে তখনই ঘটতে পারে অনর্থ। পানির উপরে ভাসমান এ ফসফেট ওখানে প্রচুর বাড়তি সার যোগায় এবং ঘন হয়ে আলজি জন্মাতে সাহায্যে করে। অর্থাৎ জলাশয়কে দ্রুততরভাবে নষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে পরিচ্ছন্নতারই নিত্য সাথী ডিটারজেন্ট। ডিটারজেন্টকে এই দোষমুক্ত করার চেষ্টা অবশ্য চলছে, সে খবর আমাদের রাখতে হবে।

শুধু তাই কেন জলাশয়ে কিছু গরম পানি ফেলছি, কিই-বা দোষ তাতে। অনেক কারখানা, কিছু ঠাণ্ডা করার জন্য পানি ব্যবহার করে; গরম হবার পর সে পানি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু জলাশয়ের একই জায়গায় ক্রমাগত গরম পানি গিয়ে মিশলে ওখানকার স্বাভাবিক চক্রের সুস্থিতি নষ্ট হতে পারে। বিপর্যস্ত হতে পারে জলজ প্রাণীর জীবন, কমে যেতে পারে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ। এ এক রকম তাপীয় দূষণ, সব সময় অবহেলা করার মত নয়।

মনে মনে আমরা যা চাই—নগরীর জন্য টলটলে পুকুর, মনোরম ঝিল, ভাল পানির উৎস, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ—তা পেতে হলে অনেক দিক থেকে সাবধান হতে হবে বৈ-কি।

# নদীকে ধোবে কে?

'বাহাত্তরটি ঘ্রাণ গুণে গুণে পেয়েছি
প্রত্যেকটি স্পষ্ট আলাদা, কয়েকটি রীতিমত কটু।
এই সে রাইন নদী, সবাই জানে
তোমাদের কলোন নগরী ধুয়ে দেয় সে।
কিন্তু অপ্সরী, বলবে কি? স্বর্গের কোন্ শক্তি
অতঃপর ধুয়ে দেবে এই রাইন নদীকে?'

মনে হতে পারে এটি জার্মানির আধুনিক কোন পরিবেশবাদীর কাব্যকীর্তি, হয়তো বা গ্রীন পার্টির প্রচার উপলক্ষে রচিত। কিন্তু না, এটি আধুনিকও নয়, গ্রীন পার্টির সঙ্গেও এর কোন সংশ্রব নেই। এই কয়টি পংক্তি বিখ্যাত ইংরেজ কবি স্যামুয়েল কোলরিজের 'কলোন' নামের কবিতার অংশ। এটি তিনি লিখেছিলেন ১৮২৮ সালে, আজ থেকে ১৬৪ বছর আগে। রাইনের পানির অবস্থা সেদিনও কেমন ছিল তা আমরা জানতে পারি এখানে। শিল্প বিপ্লবের উন্মাদনায় পরিবেশ চেতনাহীন ইউরোপে সেদিন এটিই স্বাভাবিক ছিল। আজ অবস্থার অনেক বেশি অবনতি হয়তো হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখন সেখানে মানুষ সচেতন। স্বর্গের কোন শক্তি রাইন নদীকে ধুযে সাফ করতে পারবে না এ কথা আর সেখানে কেউ মনে করে না। সে কাজ নিজেরাই হাতে নিয়েছে সেখানকার মানুষ।

আজ আমাদের নগরীগুলোকে নিত্য ধুয়ে যাচ্ছে যেসব নদী সেগুলোর কি অবস্থা আমরা দেখি? আমাদের নদীজাল আসলে পুরো দেশটাকেই ধুয়ে যাচ্ছে। কাজেই নদী ধারণ করছে পরিবেশের উপর আমাদের অসংখ্য অত্যাচারের ফলশ্রুতিকে। এর সবগুলোই যে আমরা অসতর্কতার কারণে করেছি তা নয়, বাধ্য হয়ে করেছি এমনও জিনিস রয়েছে।

উন্নত কৃষির ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের জমিতে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে প্রচুর কীটনাশক। কীটনাশকের নানা রকম রকমফেরও নতুন নতুনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। দুনিয়াতে এখন ৩৪,৫০০ রকমের রেজিস্টার্ড কীটনাশক রয়েছে যেগুলো ৯০০ বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক দ্রব্যের এক বা একাধিক দিয়ে তৈরি। এক সময় ডি ডি টি ছিল কীটনাশকের মধ্যে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত। আমাদের দেশে এর ব্যবহার এখনো শেষ

হয়ে যায়নি। কিন্তু ডি ডি টি পরিবেশে একবার মিশলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুরূহ হয়। এটি জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয়, কাজেই পরিবেশের মধ্যে জমতেই থাকে, কখনো বিলীন হয়ে যাবার সুযোগ পায় না। এমন কি গাছপালা, প্রাণীর দেহকোষেও এর উপস্থিতি দেখা যায়। ডিডিটির কথা অবশ্য যথেষ্ট প্রচারিত বলে অনেকে জানে। কিন্তু এটি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠীর কয়েকটি কীটনাশকের একটি মাত্র। কীটনাশক এখন নানা রকমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের কোন কোনটির মধ্যে আরসেনিক, সীসা ও পারদ বেশি রয়েছে যেগুলো পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল কীটনাশক সেটি অতিরিক্ত কাজ হিসাবে মাছ ও পাখির মতো যাবতীয় প্রাণীর জীবন পরিবেশ বিনষ্ট করতেও সমান দক্ষতা দেখাচ্ছে।

অধিক শস্য ফলাবার কাজে কীটনাশক যে রকম অনিবার্যভাবে এসেছে, তেমনি এসেছে সার। কৃষিতে এটি রাসায়নিক সারের যুগ। সার জমিতে দেয়া হলেও আমাদের দেশের মত যেখানে জমিতে পানিতে খালে বিলে একাকার হয়ে থাকাটাই নিয়ম সেখানে সার জমিতেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না। সারের নাইট্রেট নানা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। আবার সারের নাইট্রেট ও ফসফেট উভয়েই পানিতে অত্যধিক আলজি শৈবাল জন্মিয়ে প্রাণীর জন্য তাকে বিষময় করে তোলে।

যখন আমরা বলি নদী নগরীকে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের মনে থাকে যে এই নদীকে আমরা সমস্ত বর্জ্যের শেষ গতি হিসাবে ব্যবহার করি। মানুষের বর্জ্য, কল-কারখানা গেরস্থালীর সমস্ত বর্জ্য বাড়ছে, প্রাণী বাড়ছে, বাড়ছে কল-কালখানা আর মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিধি। কিন্তু ঐ একই নদীকেই যদি তার সমস্ত বোঝা বহন করতে হয় তাহলে আমাদেরকেও প্রশ্ন তুলতে হবে কোন শক্তি অতঃপর এই নদীর পানিকে রক্ষা করতে পারবে—যে প্রশ্ন করতে হয়েছিল দেড়শ বছরেরও আগে কবি কোলরিজকে ইউরোপের প্রেক্ষিতে। যতই আমরা মনে করি, নদী তো আর সর্বংসহা নয়।

অববাহিকার বিস্তীর্ণ কৃষি জমির মধ্য দিয়ে বয়ে আসা নদী, শহরের যাবতীয় পয়ঃপ্রণালীর নিষ্কাশন মুখ হয়ে কল-কারখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় থিক্ থিক্ করা রাসায়নিক আবর্জনায় যখন জর্জরিত হয়, তারপর এর আদি টলটলে রূপ আর কতখানি বজায় থাকে। জনসংখ্যা ও উন্নয়নের তাগিদ এই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের রেহাই দিতে পারবে না বটে, কিন্তু পরিবেশ সচেতনতা ও উদ্যোগ এর অনেকখানি আজ লাঘব করতে সক্ষম।

# শ্বাসরুদ্ধ নদী

জলচক্র আর জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা তার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে এলে সে সম্পর্কে কিছু বিষয় স্পষ্টতর হতে পারে। নদীর যে ঘোলা পানি তাতে রয়েছে শৈবাল, পানা কত কিছু! দেখে খুব একটা উৎসাহ জাগে না, কিন্তু ঐ শৈবাল, ঐ জৈব পদার্থে একটি বড় ভূমিকা রয়েছে পানিতে পরিশোধিত করে রাখার ব্যাপারে। ঐ পানি তার উৎস থেকে, আর মাটি থেকে নিয়ে যে খনিজ বহন করছে তা পানির ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের জন্য জরুরী। ঐ উদ্ভিদ আবার পানির মধ্যে অক্সিজেন বাড়ায়, যে অক্সিজেন মাছের জন্য দরকার। সুস্থ নদী তার পানিতে জীবন-শৃঙ্খলকে ধারণ করে, তার ভারসাম্য রক্ষা করে। এই শৃঙ্খলের কোন একটি অংশ ব্যাহত হলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অনেক সময় অপ্রীতিকর গন্ধই আপনাকে বলে দেবে নদীর দূষণের কথা। অতিরিক্ত দূষণ পানিতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে দূষণ পদার্থ বাড়তে পারে এমন ব্যাকটেরিয়াকুল ছাড়া আর কোন জীবনের জায়গা হয় না। জলজ উদ্ভিদ এর উপরিতলে যা সামান্য থাকে তার গায়েও পড়ে যায় দূষণের আচ্ছাদন, আলোকবঞ্চিত হয়ে তারও বৃদ্ধির পথ হয় রুদ্ধ। কিন্তু এ অবস্থাতেও যদি সময় দেয়া হয়, আরো দূষণ হবার সুযোগ না দেয়া হয়, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মেই পানি নিজেকে শোধিত করে নেবে, দূষণ বস্তু অবক্ষয়িত হয়ে পানি আবার জীবনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

বর্ষা নেমেছে, নদীর পানি দুকূল ছাপিয়ে যাচ্ছে পাশের জমিতে—জমি খাল বিল সব একাকার। নদীর পানিতে এসে পড়ছে জমির সার, কীটনাশক সবই। পানির উপর পরিবেশ থেকে আসা এসব জিনিসের প্রভাব যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে। ধরা যাক আজ মানুষ সচেতন হয়েছে। নদীর পানি সরাসরি পান করছে না, ফুটিয়ে পান করছে বা জীবাণুনাশক ফিটকিরী কিংবা ট্যাবলেট ব্যবহার করছে। শহরগুলোতে একে থিতিয়ে ফিল্টার করে, ক্লোরিন মিশিয়ে তারপর সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু এতে দূষণের সব দোষ ক্ষালন হচ্ছে কি? দু'তিন দশক আগে এ রকম পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ যা থাকত আজ সেটি অন্তত চার পাঁচ গুণ বেশি নাইট্রোজেন সারের কল্যাণে। এতে শিশুদের পেটের পীড়া এবং বড়দের পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যানসার সম্ভাবনা বাড়ার বিষয়

গবেষণায় ধরা পড়েছে। সার ছাড়াও পানিতে নাইট্রেটের আর একটি বড় সরবরাহক হলো মলমূত্র এবং শহরের পয়োপ্রণালীর সংযোগ।

সরাসরি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়া ছাড়াও অতিরিক্ত নাইট্রেট পানিতে অতিরিক্ত আলজি শৈবাল সৃষ্টি করছে। এতে নদীর পানিতে জীবন শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে। উপরিতল শৈবাল সৃষ্টি পানির ভেতরে আলো ঢুকতে দিচ্ছে না। নিচের উদ্ভিদ ও জীব মরে পচে সেখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটাচ্ছে। এভাবে যেন পানির মৃত্যু ঘটছে।

জনসংখ্যা ও কর্মকাণ্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের পয়োপ্রণালী আর নর্দমাগুলোর উপর চাপ বেড়েছে অসম্ভবভাবে। এগুলোতে যা যাবার কথা ছিল না এখন তাও যাচ্ছে। পয়োপ্রণালীর পরিশোধন ব্যবস্থা আমাদের নগরীতে যে যৎসামান্য রয়েছে তা সীসা বা দস্তা ঘটিত রাসায়নিক দূষণের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়, আরো যে বহু রকমের রাসায়নিক দ্রব্য পানিতে গিয়ে পড়ছে তার জন্য তো নয়ই। নদীর পানি এবং উপকূলবর্তী সমুদ্রের পানি এসব নানা দূষণে একান্ত ভারাক্রান্ত। এখানকার মৎস্য সম্পদের উপর এর প্রতিকূল প্রভাব এখন রীতিমত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পানি জলধারায় বাহিত হলেও, এটি আকাশ, ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-গর্ভ ব্যাপৃত জলচক্রেরই অংশ। তাই এর আলোচনায় বায়ুমণ্ডলকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। পৃথিবীর অসংখ্য কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যানবাহন এবং বাড়িঘরে যে কোটি কোটি টন ফসিল জ্বালানি পুড়ছে তা থেকে বিপুল পরিমাণ সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস আকাশে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানি পড়ার আগে এই গ্যাস দ্রবীভূত করে নিয়ে সালফিউরিক এসিড সৃষ্টি করে। তেমনি পেট্রোল ইঞ্জিন থেকে যে নাইট্রোজেন অক্সাইড বাতাসে যায় তা সৃষ্টি করে নাইট্রিক এসিড। এই এসিড বৃষ্টি মানুষের ফুসফুসের ক্ষয় করতে পারে, যেমন ক্ষয় করতে পারে মানুষের নানা কীর্তিকে—দালান কোঠা সবই। বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলরাশির অবক্ষয়ের জন্যও এই এসিড বৃষ্টিকে দায়ী করা হচ্ছে।

পানির দূষণ আমাদের শরীর স্বাস্থ্যকে আক্রমণ করছে সরাসরিভাবে। আবার বৃহত্তর পরিবেশে প্রাকৃতিক স্থিতাবস্থাকে তছনছ করে নিয়ে পরোক্ষভাবেও এটি আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। পানিকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায় যেগুলো আমাদের জন্য প্রযোজ্য এবং প্রযোজ্য বিশ্বের দেশে দেশে।

দূষণকারী সংস্থা বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সার কীটনাশক ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনার জন্য জৈব সার ব্যবহার, ভারসাম্য রক্ষা, ফসল বৈচিত্র্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষিকে উৎসাহিত করতে হবে। সর্বত্র পানি দূষণের উপর নজর রেখে এর প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শিল্প কারখানা বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার বর্জ্যগুলো কোথায় কিভাবে নিচ্ছে সে সম্পর্কে খোলামেলা তথ্য আদান প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। দূষণ রোধের জন্য আইন-কানুনগুলো সুনির্দিষ্ট করে তা কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পানির মধ্যে দিয়ে জমতে থাকে না, বরং সেখানে জৈবিকভাবে অবক্ষয়িত হয় এমন জিনিস ব্যবহারের অভ্যাস করতে হবে—যেমন প্লাস্টিক ব্যাগের বদলে কাগজ বা চটের ব্যাগ। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বা তরল পদার্থ পানিতে গিয়ে কতখানি অবক্ষয়িত হবে উৎপাদনকারীকে সে সম্পর্কে

স্পষ্টভাবে লেবেল দিয়ে জানিয়ে দিতে বাধ্য করতে হবে। তরলের মধ্যে রঙ মেশানো থাকলে অবক্ষয়যোগ্য বোঝা সহজ হবে। নগরীর পয়োশোধনের ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে হবে। সরাসরি পানিতে মলমূত্র ত্যাগ না করে গর্ত বা স্যানিটারী পায়খানার ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে। জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সালফার আর নাইট্রোজেনের অক্সাইড কমাবার উদ্যোগ নিতে হবে। নিউক্লিয়ার যে কোন স্থাপনার বর্জ্য কোথায় যাচ্ছে এবং তা যেন কোনো ক্রমেই পানিতে না যায় সে সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। মাছের আবাস, জলজ উদ্ভিদ ও মৎস্য সম্পদের প্রাকৃতিক আবাস যেন কোন কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে এমন জলাকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করতে হবে।

১৯৮১ থেকে ১৯৯১ হচ্ছে জাতিসংঘের পানি দশক। এর সুযোগ আমরা কতখানি নিয়েছি, নিতে পেরেছি এ প্রশ্ন এখন আমাদের নিজেদেরকে করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মত দেশ যেখানে পানির সঙ্গে মানুষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহঅবস্থান সেখানে পরিবেশ রক্ষায় প্রধান কাজ হলো পানির দিকে নজর দেয়া।

# পানির উৎস

আমাদের পরিবেশের একটি খুব বড় অংশ পানি। নগর জীবনে এটি হয়তো চোখে দেখে ততটা প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু দৈনন্দিন খুবই অনুভব করা যায়। নগরীর কোন এলাকায় পানি সরবরাহ লাইনে মেরামতের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হচ্ছে, দিনের পর দিন পানির সরবরাহ বন্ধ। এমন যখন হয় যে এলাকার মানুষের কি যে অবর্ণনীয় দুর্দশা হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। এমন পরিস্থিতি আমাদের নগরীতে বিরল নয়। আর তখনই বেশি করে অনুভূত হয় পানির ব্যবস্থাপনা নগর-ব্যবস্থাপনার কতখানি জুড়ে রয়েছে।

আসলে পানির ব্যবস্থাপনার দিক থেকে আমরা যেখানেই বাস করি না কেন প্রকৃতির বৃহত্তর জলচক্রেরই শরণাপন্ন হই। পুকুর নদী সমুদ্রের পানি সূর্যের তাপে শুকিয়ে বাতাসে মিশছে। এটাই উপরে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মেঘ হচ্ছে। মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে পানি আবার কিছুটা শুকিয়ে সরাসরি বাতাসে গেল, বাকিটা গড়াল ঐ জলাশয়গুলোতেই। চক্রাকারে বার বার হয়েই চলছে এটা। এর একটি অংশ চলে যাচ্ছে মাটির ভেতর। এ পানি নিজের ওজনে চুঁইয়ে নামছে বালি, কাঁকর, কাদার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে। যেখানে অপ্রবেশ্য স্তর পেয়ে আর নিচে নামতে পারছে না, সেখানে মাটি কণার ফাঁকগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে থাকছে। অন্যদিক থেকে পানি সরে এসে ভর্তি হচ্ছে আরো গভীর কোন স্তরের কণার ফাঁকগুলো। এটিই ভূ-গর্ভস্থ পানি।

মাটির নিচে সবচেয়ে উপরে যে তল পর্যন্ত পানি থাকে তাকে আমরা বলি ওয়াটার টেবল বা ভূজল-পিঠ। পানির আমদানি বেশি হলে ভূজল-পিঠ উপরে উঠে, আর বৃষ্টি বন্যা কম হলে এই পিঠ নেমে যায়। আবার কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নলকূপ খুঁড়ে খুব বেশি হারে আমরা যদি ভূ-গর্ভের পানি তুলতে থাকি, তাহলেও ভূ-জল পিঠ নেমে যায়। আমাদের নগরীতে এখন তাই ঘটছে।

নগরীর নব্বই লক্ষ মানুষের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানির যোগান দিতে গিয়ে আমরা ক্রমেই বেশি নির্ভর করেছি ভূ-গর্ভের পানির উপর। বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করে সেখান থেকে সরাসরি পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে একটি সুবিধা হলো সরবরাহের আগে পানিকে শোধন করতে হচ্ছে না। ভূ-গর্ভে যাওয়া পথ

নানারকম স্তরের মধ্য দিয়ে চুইয়ে যেতে হয় বলে ছাকনের ফলে এটি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিপদের কথা হলো সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে এতগুলো গভীর নলকূপ এই হারে পানি তোলার ফলে ভূ-জল পিঠ দ্রুত নেমে যাচ্ছে। বর্ষার বৃষ্টিতে ভর্তি হয়েও আগের জায়গায় এসে পৌঁছতে পারছে না—কারণ পানির আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হচ্ছে। এভাবে নগরীর ভূজল-পিঠ নেমে গেলে স্থায়ী ক্ষতির কারণ ঘটবে।

এর বিকল্প হচ্ছে নগরীর ভেতর বা আশপাশের জলধারা বা জলাশয়ের পানি ব্যবহার করা। নদীর পানিই ছিল ঢাকা নগরীর পানির বরাবরের প্রধান উৎস। বিভিন্ন মহল্লায় স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হত কূপের পানি। এ রকম অনেক কূপ ছিল শহরের নানা জায়গায়। খাবার পানির জন্য প্রধানত এগুলোই ব্যবহৃত হত। অন্যান্য কাজের জন্য ভিস্তিরা চামড়ার মশকে নদীর পানি এনে দিত অনেক বাড়িতে। পরবর্তীকালে শহরে শোধিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল নদীর পানিকে ভিত্তি করেই। এই শোধনের প্রকৃতি অনেকটা গ্রামের বাড়িতে আমরা যেভাবে পানি শোধন করে নিতে পারি সে রকমই। পানিকে স্থির করে দিলে অপেক্ষাকৃত বড় ময়লা কণাগুলো থিতিয়ে নিচে পড়ে। এরপর ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নিলে পানি প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়। জীবাণু নষ্ট করার জন্য মৃদু জীবাণুনাশক মেশানো যায় এ পর্যায়ে।

# ভূ-গর্ভের পানি : আরো সমস্যা

আমাদের জীবনযাত্রায় বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা যতই আমরা উপলব্ধি করেছি ততই ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর আমাদের নির্ভরতা বেড়েছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি এক সময় দুর্লভ ছিল। আজ গ্রামবাসীর পক্ষে কাছে ধারে একটি নলকূপ পাওয়া বিরল ঘটনা নয়। নলকূপের পানিই অধিকাংশ মানুষকে বিশুদ্ধ পানির যোগান দিচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে দৈনিক যে বিপুল পরিমাণ পানির সরবরাহ প্রয়োজন হয় তারও একটি বিরাট অংশ আসছে নগরীর বিভিন্ন গভীর নলকূপ থেকে। ভূ-গর্ভস্থ পানির পুরো ব্যাপারটি তাই আমাদের বিশেষ মনোযোগ পাওয়ার দাবিদার।

বৃষ্টি পানি ভূ-ত্বকের নানা স্তরের মধ্য দিয়ে চুইয়ে শেষ পর্যন্ত যখন একটি অপ্রবেশ্য স্তরে গিয়ে পৌঁছে তখন সেটি সেখানেই জমতে থাকে। এর উপরের স্তরগুলোর শিলা, কণা তখন পানিতে সম্পৃক্ত হয়ে উঠে। পানির পরিমাণ অনুসারে ক্রমেই উপর থেকে উপরের স্তর এভাবে সম্পৃক্ত হয়। এ রকম সম্পৃক্ত স্তরের সর্বোচ্চ তলকে বলা হয়, ওয়াটার টেবিল বা ভূজলতল। অত দূর পর্যন্ত যদি আমরা কূপ খুঁড়ি তবে পানি পাওয়া যায়।

এর মধ্যে যখন নলকূপ নামানো হয়, তখন এ পানি আমরা পাম্প করে উপরে আনতে পারি। নামানো নলের নিম্নাংশ যেটুকু সম্পৃক্ত স্তরের মধ্যে ঢুকে তা সচ্ছিদ্র তাতে করে শিলা কণার ফাঁক থেকে পানি যথেষ্ট জায়গা জোড়া স্থান থেকে নলের ভেতর ঢুকতে পারে। ভূ-গর্ভের পানি অফুরন্ত নয়। যে পানি আমরা পাম্প করে তুলে ফেলি যদি আবার বৃষ্টির পানি গিয়ে তার অভাব পূরণ না হয় তাহলে আর আমরা পানি পাব না। কি হারে আমরা পানি তুলছি আর কি হারে তার পূরণ হচ্ছে পুরো ব্যাপারটি তার উপরেই নির্ভর করে। যে বছর খরা হয় সে বছর তাই ভূ-গর্ভের পানিতেও টান পড়ে। আবার কাছাকাছি অনেকগুলো গভীর নলকূপ বসালেও পানিতে টান পড়ে।

শুধু পানির প্রাপ্তির ব্যাপারেই নয়, বৃষ্টির পানির দ্বারা ক্ষতিপূরণ হতে পারে না এমন হারে যদি আমরা ভূ-গর্ভের পানি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে থাকি তবে আরো নানা রকম পারিবেশিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভূ-গর্ভের একটি সম্পৃক্ত স্তর এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না বহুদূরব্যাপী এর বিস্তৃতি ঘটতে পারে। সাধারণভাবে ঐ অঞ্চলে ভূ-

গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে গেলে পুরো এলাকাতেই পানির স্তর কমে যেতে পারে। বলা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত নলকূপের আওতার মধ্যে পানি থাকছে ভূ-গর্ভের স্তর কমে গেলে কি ক্ষতি। অন্তত গাছপালার পানি পাওয়ার সঙ্গে তো তার সম্পর্ক না এক দিক থেকেও এ সম্পর্ক আছে বৈ-কি।

পুকুরে, খালে-বিলে, নদীতে শুষ্ক মৌসুমে কতখানি পানি থাকবে তার সঙ্গে ভূ-জল তলের সম্পর্ক রয়েছে। বর্ষায় এ সবে পানি বাড়ে; শীতে, বসন্তে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বছরের পর পর বছর ধরে এই উঠা-নামা একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখে। ফলে এদের আশ্রয় করে জলনির্ভর উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং তার পরিবেশ গড়ে উঠে। এদের আশপাশে অধিক সংখ্যক নলকূপ বসিয়ে যদি এমন অতিরিক্ত পানি তোলা আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘদিনের পানির সুস্থিতি এতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরিবেশেও তার প্রভাব পড়ে। পুকুর খাল-বিল নদীর পানির উপর নির্ভরশীল ঐ জীব পরিবেশ অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়।

ভূ-জল তল কমে গেলে নদীর বহতাও কমে যায় বিশেষ করে নদী যখন বৃষ্টি, বরফ গলা পানি ইত্যাদি বাইরের উৎসের অভাবে সংযুক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরই বেশি নির্ভর করে। নদীর বহতা কমে যাওয়ার বিপত্তি অনেক। পানির অভাব তো হয়ই তাছাড়া যেসব দূষণ পদার্থ দুই পার থেকে নদীতে গিয়ে পড়ে পানিতে তার ঘনত্ব বেড়ে যায় নদী হয় দূষিত পানির একটি প্রবাহ। উপকূলের কাছে গিয়ে এ রকম নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। শহর-বন্দর-লোকালয়ের পানির উৎস যে নদী তাতে এমনটি ঘটলে পানির সরবরাহ বিশুদ্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

লবণাক্ততার ব্যাপারটি উপকূলীয় অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিজের ক্ষেত্রেও ঘটে। অধিক হারে পানি তোলা হলে সমুদ্র সংলগ্ন সম্পৃক্ত স্তরে লবণাক্ত পানি এসে ঢুকে। শেষ পর্যন্ত নলকূপে পাম্প করলে এই লবণাক্ত পানিই উঠতে থাকে। দক্ষিণ বাংলাদেশে এমনটি ঘটার অনেক নজির রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির অধিক ব্যবহারে আর একটি পারিবেশিক কুফল হলো ভূমি বসে যাওয়া। বিশেষ করে নগরাস্থলে এ রকম ভূমি বসে যাওয়ার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। বিদেশে বড় বড় কিছু নগরে দু তিন দশকের মধ্যে এভাবে এক মিটার পর্যন্ত মাটি বসে যেতে দেখা গেছে বিরাট এলাকা জুড়ে। আমাদের নগরীতে যে এমনটি ঘটবে না, কে বলতে পারে।

# ভূ-তলের পানিতে দূষণ

নগরে পানির জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে বিপত্তি দেখা যাচ্ছে। জনসংখ্যার কারণে পানির প্রয়োজন হচ্ছে প্রচুর। এত পানি ভূ-গর্ভস্থ থেকে তুলতে গিয়ে পানির তল নেমে যাচ্ছে আশংকাজনকভাবে। আমাদের নগরীতে এখন পৃষ্ঠদেশের পানি শোধন করে যতটুকু ব্যবহার করা হচ্ছে তার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে বাড়াতে হবে। কিন্তু পৃষ্ঠদেশের পানি অর্থাৎ নদী-খাল-পুকুরের পানি সহজেই দূষিত হতে পারে এবং হচ্ছেও। এই দূষণের মাত্রা না কমানো গেলে শোধন সত্ত্বেও ভাল পানি নগরীর জন্য পাওয়া যাবে না। তাছাড়া দূষণের কোন কোনটি ভূ-গর্ভস্থ পানিকেও দূষিত করে তুলতে পারে।

নগরীতে চাষ বাস না থাকলেও কীটনাশকের কমতি নেই। মশা ধ্বংসকারী ওষুধ তার মধ্যে একটি। তাছাড়া নদীর পানি নগরীর বাইরে কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের দ্বারাও দূষিত হয়ে আসছে। আজকাল উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদে কীটনাশকের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এক সময় মশার মত উৎপাতই হোক আর ফসলের কীটই হোক এর বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র ছিল ডি. ডি. টি.। ডি. ডি. টি. খুবই কার্যকর ওষুধ। কিন্তু তার একটি বড় দোষ যে সে জৈব অবক্ষয়শীল নয়। অর্থাৎ কাজ শেষের পর এটা নিজকে বিলীন করে ফেলতে পারে না। বরং এটা থেকে গিয়ে ক্রমাগত জমতে থাকে। পানিতে গিয়ে এটি খাদ্যের চেইনের মধ্যে চলে যায়। খাবারের সঙ্গে এটি আমাদের দেহে আসে এবং বিষক্রিয়া ঘটায়। সারা দুনিয়ায় ডি. ডি. টির ব্যবহার এত বেড়েছিল যে সুদূর নির্জন আন্টার্কটিকায়ও পেঙ্গুইনের দেহেও ডি. ডি. টি. পাওয়া যাচ্ছিল। উন্নত দেশগুলোতে ডি. ডি. টি. ব্যবহার বন্ধ হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। আমাদের দেশেও এটি নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু সস্তা কীটনাশক হিসাবে নানা কিছুতে এর ব্যবহার এখনো রয়ে গেছে।

ডি. ডি. টি. ছাড়াও অন্যান্য কীটনাশকের মধ্যেও আমাদের দেহের জন্য কমেবেশি ক্ষতিকর বস্তু রয়ে গেছে। কাজেই কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। একই কথা রাসায়নিক সার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সারের মধ্যে যে ফসফেট এবং নাইট্রেট রয়েছে সেগুলো মাটি থেকে ধুয়ে নিয়ে যায় পানিতে। নাইট্রেট

পরে নাইট্রাইটে পরিণত হতে পারে যা রক্তের মধ্যে অক্সিজেন গ্রহণের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। পানি শোধনের যেসব সাধারণ ব্যবস্থা রয়েছে তাতে নাইট্রাইট দূর করার কোন ব্যবস্থা নেই।

নাইট্রেট এবং ফসফেট উভয়েই যেহেতু উদ্ভিদের সার এরা পানিতে গেলে সেখানে ক্ষুদ্র আলজি জাতীয় উদ্ভিদ অতিমাত্রায় জন্মাতে সাহায্য করে। পানির অক্সিজেন ব্যবহার করে ফেলে বলে এ রকম অতিরিক্ত আলজির বৃদ্ধি পানিকে দূষিত করে ফেলে। ডিটারজেন্ট সাবান পানিতে গিয়ে পড়লেও এই একই ব্যাপারটি ঘটে।

পানি দূষণের একটি বড় উৎস হলো মানুষের মলমূত্র। যে বিশাল জনগোষ্ঠী নগরীতে বাস করছে তার কত অংশের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে? অনেকের জন্য কোন রকমের কোন ব্যবস্থাই নেই। রাস্তার ধারে, নালায়, ডোবায় যে যেখানে পারছে মলত্যাগ করছে। শেষ অবধি এটি ঠাঁই পাচ্ছে আমাদের পানি ব্যবস্থায়। একেবারে কোনরকমের প্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত সরাসরি মল পানিতে যাওয়া অত্যন্ত দূষণকারী একটি ব্যাপার। এ রকম পরিস্থিতিতে নগরীর পরিবেশ রক্ষা করার কি উপায়ই থাকতে পারে। মানুষের মল বহু রকমের জীবাণু এবং জৈব দূষণের উৎস পানির আঁধারে গিয়ে বহুতরো দূষণ প্রক্রিয়ার সূচনা করতে পারে।

নগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত যেসব পায়খানা এখানে রয়েছে তাও যে দূষণের কোন উৎস নয় একথা বলা যাবে না। বৈজ্ঞানিকভাবে এর সমস্ত জৈব বর্জ্যকে শোধন করার কোন ব্যবস্থা আমাদের নেই। এর অধিকাংশই নির্দোষ হবার আগেই পানির উৎসগুলোতে গিয়ে মিশতে পারছে। তাছাড়া সব সময় দীর্ঘ সময় যে বর্জ্যকে ভূ-গর্ভস্থ নর্দমায় অধিক সময় ধরে রাখা যাচ্ছে তাও নয়, একই প্রণালী দিয়ে যাচ্ছে মল ছাড়াও নগরীর যাবতীয় তরল বর্জ্য ও পানি। বৃষ্টি বেশি হলেই উপচে বাইরে আসছে এসব। সেই সঙ্গে জৈব মল।

নগরীর ছোট বড় কলকারখানাগুলো ব্যবহার করছে নানা রকমের কাঁচামাল আর নানা রাসায়নিক দ্রব্য। অনেক ক্ষেত্রে কারখানা থেকে যে তরল পরিত্যাক্ত হচ্ছে তাতে যে কি আছে তা কারখানা যারা চালায় তারাও জানে না। নির্দ্বিধায় এ সব পরিত্যক্ত তরলকে ছেড়ে দেয়া হয় কাছের নর্দমায়, ডোবায় বা যে কোন জায়গায়। এর মধ্যে থেকে যায় শরীরের জন্য বিষময় এমন বহু জিনিস।

পানি দূষণ সব জনপদের জন্যই বিপজ্জনক। কিন্তু নগরীতে বসতির ঘনত্ব এবং দূষণের ঘনত্ব একে অতিরিক্ত বিপজ্জনক করে তুলতে পারে। তাই নগরীতে যাবতীয় দূষণ দ্রব্যের নিষ্কাশন এবং এর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এই দুই বিষয়কে একত্রে দেখা প্রয়োজন।

# আবদ্ধ পানি, বিপর্যস্ত নাগরিক

হঠাৎ করে প্রবল বৃষ্টি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল নগরীর অনেকগুলো ছোট বড় সড়ক এমনকি পুরো এলাকা পানিতে ডুবে গেল। আমাদের বড় দুটি নগরী ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে এটি হরদম ঘটছে। বেশ খানিক্ষণ রাস্তা-ঘাট এভাবে ডোবা থাকলে নগরজীবনের পরিবেশে কি হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। নগরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, জন স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ব্যবস্থা এবং সুচারু অবস্থায় রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণে এটি দুরবস্থা নিয়ে আসে। আর তাৎক্ষণিকভাবে চলাচলের বিঘ্ন তো রয়েছেই।

নগরীর এই ক্ষণস্থায়ী বন্যার সঙ্গে অবশ্য দেশের বৃহত্তর দীর্ঘস্থায়ী বন্যার জল-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বেশ কিছু মিল রয়েছে। তাই একই সঙ্গে এই দুইয়ের কতগুলো সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভূমির উপরিতলে যে কোন উৎস থেকে আসা পানি ঢালের দিকে গড়িয়ে প্রবাহিত হতে চেষ্টা করে। এই উৎস হতে পারে ভারী বৃষ্টির পানি যা যে হারে আসে সে হারে ভূ-গর্ভে চলে যেতে পারে না। অন্যত্র কোন উৎস থেকে প্রবাহিত পানিও এটি হতে পারে তা সেখানকার বৃষ্টি, বরফগলা পানি, কিংবা ভূ-গর্ভস্থ পানি ভূজল তলের উন্মুক্ত স্থান থেকে বেরিয়ে আসছে এমনও হতে পারে।

উৎস যাই হোক, সম্ভাব্য নানা পথে এই পানি ঢালের দিকে গড়িয়ে স্থান ত্যাগের ব্যবস্থা থাকা চাই নইলে কোন না কোন রকমের বন্যার অবস্থা সৃষ্টি হবেই। নানা পথের সমন্বয়ে পানিকে সরাবার এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটিই ড্রেনেজ বা নিষ্কাশন ব্যবস্থা। নগরীর কেন্দ্রে এটি এর ভূতলের বা ভূ-গর্ভের নর্দমা, যেখানে খাল রয়েছে সেই খাল। এ সবের মাধ্যমে পানি শেষ পর্যন্ত গিয়ে হয়তো গড়ায় কোন নদীতে। আর দেশের সামগ্রিক নিষ্কাশন ব্যবস্থায় তো রয়েছে আমাদের অসংখ্য খাল নদীর বিস্তৃত জাল।

বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট হঠাৎ বন্যায় মোট কি পরিমাণ পানি গড়াতে চাইবে তার হিসাব করা খুব সহজ। বৃষ্টির পানি মাপা হয় ঘণ্টায় কত সেন্টিমিটার পানি জমলো সেই হিসাবে। এর মধ্যে ঘণ্টায় কত বৃষ্টির পানি মাটি চুইয়ে ভূ-গর্ভে ঢুকলো সেটি বাদ দিলে বাকি পানিকে গড়িয়ে বের হতে হবে। একেও মাপা হয় ঘণ্টায় সেন্টিমিটারের হিসাবে।

পানি গড়াবার মূল নিয়ামক হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এটি প্রবাহে বেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক কিছু আছে যা এ প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। বাধার মুখে প্রবাহকে

মসৃণ স্রোতে না গিয়ে এদিক-ওদিক এবং নানা রকম বিশৃঙ্খল ঘূর্ণিতে পর্যবশিত হয়ে এগোতে হত পারে। শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে একক সময়ে কি আয়তন পানি সরবে সেই পরিমাপটি গুরুত্বপূর্ণ। পানি গড়াবার যে খাত তার প্রকৃতি বিশেষ করে তার প্রশস্ততা আর গভীরতা পানি সরে যাওয়ার পরিমাণটি বাড়াবার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্পষ্টত আমাদের নগরীতে বৃষ্টির পরিমাণ একটি নিম্নসীমা অতিক্রম করলেই ঐ খাতের ক্ষমতায় আর কুলায় না। উপযুক্ত নর্দমা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব নগরীর নানা অঞ্চল ডুবে যাওয়াকে একটি নিত্য ঘটনায় পরিণত করেছে।

সার্বিকভাবে দেখতে গেলে নগরীর অবস্থিতিই আবার এ অঞ্চলের পানি প্রবাহে এবং বন্যা পরিস্থিতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথমত নগরীর অর্থই হচ্ছে উন্মুক্ত মাটির অভাব। দালান, রাস্তা, ফুটপাত ইত্যাদিতে ভরা নগরীতে সবই প্রায় বাঁধানো জায়গা। মাটি ভেদ করে কিছু পানি ভূ-গর্ভে চলে যাবে সে সম্ভাবনা এখানে কম। তাই নগরীর উপর ঝরা বৃষ্টির পানির অধিকাংশই গড়াবার পানি। বাইরে থেকে গড়িয়ে যে পানি নগরীতে ঢুকছে তার অবস্থাও একই। দ্বিতীয়ত নগরীর নির্মাণে চেষ্টা থাকে পানিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বের করে দিতে। এ চেষ্টায় ব্যর্থ হলে কি ঘটে তাতো আমরা দেখছিই। আর চেষ্টা সফল হলেও নগরীর জন্য না হোক আশপাশের জন্য বন্যা অবস্থা বাড়াতে পারে। আশপাশের যে খাল বা নদীতে শেষ পর্যন্ত এই পানি যায়, এর ফলে সেখানে অতি দ্রুত অতি বেশি পানি চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সার্বিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে একটি সাধারণ সুস্থিতি কাজ করে। চারদিকের পানি একটি প্রধান খাতের মধ্যে যাবার আগে ভূমিতে ও অন্যান্য অপ্রধান খাতে এটি কতক্ষণ কাটাবে তার একটি স্বাভাবিক সময় আছে। এই সময়কে যদি স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত ত্বরান্বিত হতে হয় এবং পানির পরিমাণও যদি একই সঙ্গে বাড়ে তবে এই প্রধান খাতের দুই কূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করা বিচিত্র নয়।

বন্যা আমাদের জাতীয় সমস্যা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই এতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। দারুণ পরিবেশ সংকটের মুখোমুখি হয়। কিন্তু এর সঙ্গে নগরীর নিজস্বও কিছু বন্যা পরিস্থিতি রয়েছে, যার একদিকে যে যেমন ভুক্তভোগী, অন্যদিকে সে একটি কারণও বটে।

# তারপর বন্যা

অধিক বৃষ্টির ফলে নগরীতে বন্যার অবস্থা সৃষ্টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা গ্রাম আর নগরীর মিলিত সার্বিক বন্যার বিষয়ে এসে পড়েছি। প্রতি বছরই আমরা দেশের কোন কোন অঞ্চলকে বন্যা পীড়িত পাচ্ছি। প্রতি বছরই পাই দেশের ভেতরে এবং বাইরে বৃষ্টি বা অন্য উৎস থেকে পানি বাড়লেই নদী খাল, বিল ফেঁপে ওঠে। পানির ঐ আমদানি স্বল্পস্থায়ী হলে জলধারাগুলো আবার স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে যায়। বলা যায়, এভাবে পানি বন্যা তরঙ্গের মত পর পর ওঠানামা করে। এ তরঙ্গ ঘন ঘন হলে, উঁচু হলে ব্যাপক বন্যার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

প্রধান নদীগুলোর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সার্বক্ষণিকভাবে পানির উচ্চতা মাপার ব্যবস্থা থাকে। এটি বন্যার আশংকার কিছু পূর্বাভাস দিতে পারে। তাছাড়া জলধারাগুলোর স্রোত সম্পর্কে দীর্ঘকালীন তথ্য থাকলে এর পরিবর্তন থেকে আগাম বন্যার সংকেত পাওয়া সম্ভব।

বন্যা সমস্যা আমাদের দেশের পরিবেশের উপর বলতে গেলে সবচেয়ে বড় হুমকি। এ নিয়ে বহুকাল ধরে চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, কিছু কিছু ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে স্থানীয়ভাবে বন্যাকে ঠেকাবার মত। কিন্তু বড় বন্যা, বিশেষ করে ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবনের মত বন্যা এটি ঠেকাতে পারেনি কোথাও। খোদ ঢাকা নগরীর অবস্থা তখন কি হয়েছিল সে কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এরপর থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে বন্যার পারিবেশিক প্রভাব এবং একে স্থায়ীভাবে ঠেকাবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। কিছু কিছু কারিগরি পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে।

ব্যাপক ও বিধ্বংসী বন্যার বিরুদ্ধে প্রকৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে প্রধানত দুটি দিক থেকে দেশের মধ্যে। বিশেষ করে বন্যা এলাকাতে যে পানির উৎস তাকে যথাসম্ভব অধিক্ষণ বিস্তৃত ভূমি পৃষ্ঠে বা ছোট ছোট জলাশয় জলধারায় রেখে দেবার ব্যবস্থা করে আমরা তা বড় নদীগুলোতে তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে বাধা দিতে পারি। ভেতর বাইরের দ্রুত এসে পড়া অত্যধিক পানিতে বড় নদীগুলোর অবস্থা যখন কূল ছাপানো তখন এই বিলম্ব বন্যাকেও কিছুটা বিলম্বিত করতে পারে। ইতোমধ্যে বড় নদীর পানি সাগরে চলে যেতে পারলে বন্যাকে ঠেকানো বা কমানোও যেতে পারে।

এই সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণটি আমরা করতে পারি প্রধানত ভূমির উদ্ভিদ আচ্ছাদন বাড়িয়ে। ভূমিতে গাছপালা ও অন্যান্য উদ্ভিদ যত অধিক যত ঘন হতে থাকবে ততই পানি সহজে গড়িয়ে জলধারায় যাবার আগে মাটিতে চুঁইয়ে ভূগর্ভে চলে যাবার সম্ভাবনা বাড়ে। মাটির উপর দিয়ে গড়ানো পানির পরিমাণ এতে কমে যাবে, বড় নদীর উপর চাপও কমবে। গাছপালা পানিকে গড়াবার গতিকে হ্রাস করিয়ে ভূগর্ভে যাওয়ার সুযোগ করে দিলে বন্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। বৃক্ষরোপণ ও অধিক উদ্ভিদ আচ্ছাদন সৃষ্টির এই ব্যবস্থা সার্বিক পরিবেশ উন্নতির সঙ্গে অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে পানি বাহিত হয়ে ভূমি ক্ষয় এবং মাটির ভাঙন রোধের ব্যবস্থার সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বন্যা ঠেকাবার জন্য যে প্রকৌশল ব্যবস্থাটা নেয়া যেতে পারে সেটিই আমাদের পরিকল্পনা অধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। এটি হলো নদী অববাহিকার উপর সরাসরি কারিগরি হস্তক্ষেপ। এখানেও দুটি উপায় রয়েছে যা নানা দেশে অনুসরণ করা হয় এবং এদের তুলনামূলক কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর একটি হলো নদীর দুই পারে উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ। অন্যটি হলো আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো জলধারাগুলোকে খাল কাটার মাধ্যমে সংক্ষেপে ও সহজ করে দেয়া।

নদী প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালে উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে পানিকে নদীতেই আটকিয়ে রাখার চেষ্টা আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। স্পষ্টত এটি কার্যকর ব্যবস্থা। তবে অনেক সংখ্যক দীর্ঘ নদীর এই দেশে এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। সত্যিকার অর্থে সব অবস্থায় কার্যকর হতে হলে বাঁধগুলো হওয়া চাই যথেষ্ট উঁচু এবং বলিষ্ঠ। নইলে বড় বন্যা ও বাঁধ পার হয়ে যেমন যেতে পারবে, তেমনি পানির চাপে বাঁধে ফাটল সৃষ্টি হয়ে এটি বিপন্ন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া আমাদের দেশের যে নদীগুলো তাতে এ ব্যবস্থার ঘন ঘন যে পরিমাণ বাঁধের সৃষ্টি হবে তা পানির স্বাভাবিক চলাচলকে বাধা দিয়ে অন্য রকম পারিবেশিক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যদিকে নদীর জল প্রবাহকে খাল কেটে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করার সুবিধাটি হলো অনেকটা নদীর তলাকে কেটে আরো খাঁড়া করে স্রোত বাড়িয়ে দেয়ার মত। এর ফলে নদীতে যে পানি আসবে তা দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হয়ে চলে যেতে পারে। নদী যদি অপ্রশস্ত বা অগভীর হয় তাহলেও পানি চলে যাবার অনুকূল পরিবেশ হয় এতে। আমাদের পরিকল্পনাতে এসব উপায়গুলোর প্রত্যেকটিকে বিবেচনায় রাখা উচিত অবস্থার চাহিদা অনুসারে।

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বন্যার পানি থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ প্রকৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। ঢাকা রক্ষা বাঁধ এমনি একটি ব্যবস্থা। এ সবের কার্যকারিতা এবং সার্বিকভাবে পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের উপর এর পারিবেশিক প্রভাব সম্পূর্ণ বিবেচনা করেই এ ধরনের বিশেষ আঞ্চলিক ব্যবস্থায় হাত দেয়া উচিত। বন্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান একটি সরল ব্যাপার নয়, এটি দেশের সার্বিক পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সেভাবেই একে দেখা উচিত।

# এ কী রকম বাতাস?

পরিবেশের যে জিনিসটাতে আমরা একেবারে ডুবে আছি সে হলো বাতাস। শুধু ডুবে আছি বলবো কেন দমে দমে এ বাতাস টেনে নিয়েইতো আমরা আমাদের দেহের ভেতর বাহির সম্পৃক্ত করে রেখেছি। কাজেই এ বাতাসের কিছু হলে তার প্রভাব শরীরে পড়বে মুহূর্তের মধ্যেই। আর বায়ুমণ্ডলের বাতাস সর্বত্রগামী। বিশেষ করে নগর জীবনে দূষণের যে শত আয়োজন আমরা করে রেখেছি, তার হাত থেকে রেহাই পায় না আমাদের ফুসফুস, আমাদের সমস্ত শারীরতন্ত্র।

সুদূর অতীতের দিকে যদি তাকাই দেখি কখনো এক একটি জনপদে এ বাতাস দারুণভাবে জীবনের বিপক্ষে গিয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটেছে প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। খ্রিস্টীয় ৭৯ সালে রোমান নগরী পম্পেইতে নগরবাসীরা যে দলে দলে মারা গেল, তাদের অনেকে লাভায় চাপা পড়ে নয়, বরং বিষাক্ত বাতাসে নিশ্বাসের গোলযোগে, ফুসফুসে প্রদাহে। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময় নির্গত ছাই ও গ্যাস বাতাসকে এমনিভাবে বিষাক্ত করতে পারে। এরকম ঐতিহাসিক তাৎক্ষণিক বিপর্যয় অবশ্য প্রকৃতিই ঘটাতে পারে। কিন্তু সেই যুগেই খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এই বলে যে, যে বাতাসের মধ্যে এবং যে বাতাসের সাহায্যে সমস্ত প্রাণীকে বাঁচাতে হবে তাকে কিনা আমরা দূষিত করে প্রাণীকুলকে দুঃখ ও ধ্বংসের সম্মুখীন করে চলেছি। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট বায়ু দূষণের ব্যাপারটি সেই প্রায় দু'হাজার বছর আগেও সচেতন ব্যক্তিদেরকে ভাবিয়েছে।

কিন্তু বায়ু দূষণের কিই-বা আয়োজন সে কালের জনপদগুলোতে ছিল—আজকের তুলনায় তেমন কিছুই নয়। নানা কাজে জ্বালানি কাঠ তখন পুড়তে হত আর তার ধোঁয়াই হয়ত ছিল দূষণের প্রধান কারণ। যদিও কাঠের দহনে এক শ'টিরও বেশি জৈব উপাদানকে আলাদা করা যায় তবুও তার তুলনায় অনেক বেশি দূষণকারী জ্বালানি পরে এসেছে। ১২৯৫ সালে মার্কোপলো যখন এশিয়ায় ভ্রমণ শেষে ইতালিতে ফিরে গেলেন তিনি পোড়া যায় এমন এক কালো পাথরের গল্প সেখানে করেছেন। এই কালো পাথর একদিন ইউরোপের শিল্প সভ্যতায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কয়লা একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছিল সমৃদ্ধি, অন্যদিকে তেমনি বায়ু দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল

অনেক গুণে বেশি। তারপর তেল, গ্যাস এসবও একে একে যোগ দিয়েছে শিল্পের প্রয়োজনে। এক দিকে নগরীর ঘনবসতি অন্যদিকে বিভিন্ন জ্বালানিয় দহনজাত ধোঁয়ার ক্রমবর্ধমান আধিক্য সর্বত্র বিশেষ করে নগরাঞ্চলের বাতাস ভাল রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়েছে।

সব জ্বালানিতেই রয়েছে প্রধানত কার্বন। দহনের ফলে তৈরি হয় প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। জীবজগতে এই গ্যাসের একটি ভূমিকা রয়েছে বিশেষ করে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরিতে। কিন্তু সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ার এই গ্যাসের অধিক নিঃসরণ আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটি হলে গ্রীন হাউজ এফেক্টের মাধ্যমে। অধিক কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপ আটকিয়ে রেখে পৃথিবীকে একটু একটু করে অধিকতর উত্তপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। এর যে বহু রকম সুদূরপ্রসারী কুফল রয়েছে তা বলাই বহুল্য। কিন্তু দহনের ফলে নিত্য তৈরি হচ্ছে আরো প্রত্যক্ষভাবে বিষময় কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। শরীরের উপর এই গ্যাসের প্রভাব খুবই ক্ষতিকর। স্বল্প পরিমাণে রক্তে গেলেও এর ফলে নাড়ির স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ এবং মস্তিষ্ক ক্ষমতার উপর যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করেও এর বিষক্রিয়া শরীরে অনুভূত হতে পারে। আমাদের নগরীগুলোতে কার্বন মনোক্সাইড উৎপাদনের প্রধান উৎস হলো এর গাড়িগুলো। বায়ু দূষণের প্রায় সর্বাংশের জন্যই দায়ী হলো মোটরগাড়ির জ্বালানি দহনের পর পরিত্যক্ত গ্যাস। এই গ্যাসের মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি।

দহনের ফলে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডই একমাত্র নয়। কয়েক রকমের নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এবং সালফার অক্সাইড এর মধ্যে রয়েছে। এসবেরও একটি বড় অংশ আসে মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ধোঁয়া এবং বাড়ি ঘরের কাজকর্মে উৎপন্ন ধোঁয়া। এ সব গ্যাস ছাড়াও ধোঁয়ার মধ্যে থাকে কঠিন পদার্থের অতিক্ষুদ্র সব কণা। এগুলোর অধিকটাই ধোঁয়াকে কালো এবং দৃশ্যমান করে তোলে। অনেক সময় বিষাক্ত গ্যাসের বিষক্রিয়া এসব কণার উপস্থিতির ফলে আরো বৃদ্ধি পায়। নগরের বাতাসে এসব ক্ষতিকর ধোঁয়া কণারও প্রায় অর্ধেকটা আসে মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে।

এখন খুবই স্পষ্ট যে আমাদের মহানগরীর বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হলো মোটরগাড়ির ধোঁয়া। নগরী বড় হচ্ছে, ব্যস্ত হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে একদিকে ট্রাক, বাস, টেম্পো প্রভৃতি সাধারণ যানবাহনের সংখ্যা অন্যদিকে ছোট মোটরগাড়িরও সংখ্যা। জ্বালানি দহনের ফলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে বেশ কিছু বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া কণা এখান থেকে নির্গত হবেই। কিন্তু এর মধ্যে বেশ কিছু গাড়ির ইঞ্জিনের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এতে অসম্পূর্ণ অদক্ষ দহনের ফলে দূষণ ঘটে আরো তীব্র মাত্রায়।

মোটরগাড়ির বড় উৎসটির সঙ্গে ক্রমেই যুক্ত হচ্ছে শিল্প কারখানার দূষণ উৎস। অধিকাংশ বড় শিল্প কারখানা অবশ্য রয়েছে নগরীর উপকণ্ঠে। কিন্তু নগরীর ভেতরেও

ছোট ছোট চুল্লি চিমনী ইত্যাদির আকারে যত দূষণ উৎস রয়েছে তাও কিন্তু নেহাৎ কম নয়।

অতীতে আমরা এ সবের শুধু সুবিধার দিকটিই দেখেছি। নগরে কত যানবাহন সৃষ্টি হচ্ছে, শিল্প কারখানা কেমন বাড়ছে তার উন্নয়নটি আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এ সবের ফলশ্রুতিতে বায়ু দূষণকে আমরা যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না সে কথা আমাদেরকে যথেষ্ট পীড়া দেয়নি। আজ কিন্তু ঘনবসতির এ নগরীতে এ বিষয়টিকে অবহেলা করার উপায় নেই। বিশ্বময় গ্রীন হাউজ এফেক্টে অবদান রাখার কথা যদি ছেড়েও দিই, এগুলো আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষভাবে বিপর্যস্ত করছে। এর যে সামগ্রিক ফল তার হাত থেকে আমরা নগরবাসীদের কেউই বাঁচতে পারি না।

বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর মধ্যে শরীরের উপর প্রভাবটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে নগরীতে এর অন্যান্য ক্ষতির দিকও রয়েছে। ধাতু, কংক্রীট, রাবার, চুনাপাথর ইত্যাদি বায়ু দূষণের ফলে অনেক বেশি হারে অবক্ষয়িত হয়। দালান কোঠা, সেতু এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদও তাই বায়ু দূষণের কবল থেকে মুক্ত নয়। এক্ষেত্রে অবস্থা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সে জন্য কিছু চেষ্টা অন্তত আমরা করতে পারি।

মোটরগাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি আমরা থামাতে পারবো না। স্বাভাবিকভাবে এর সৃষ্টি দূষণও এ পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী, যদিও উন্নত দেশে প্রচুর চেষ্টা চলছে নতুন ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহার করে, জ্বালানি শোধনের এবং পরিত্যক্ত ধোঁয়ার প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করে নতুন ধরনের কম দূষণকারী মোটরগাড়ির প্রবর্তন করতে। আপাতত আমরা অন্তত দূষণ মাত্রায় অগ্রহণযোগ্য ত্রুটিপূর্ণ মোটরগাড়িগুলোকে বন্ধ করার সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারি। কল-কারখানার ধোঁয়া সম্বন্ধে একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

আজকাল বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। নতুন গাড়ি, কল-কারখানা সবই ধীরে ধীরে পরিবেশ মনোযোগী রূপ লাভ করবে। আমাদেরকেও ভবিষ্যতের যানবাহন ও শিল্প নির্বাচনে এ দিকটিকে ক্রমেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

# অপরাধী গাড়ি

নগরীতে বাতাসের দূষণ নিয়ে যখন আমরা ভাবি তখন দুটি প্রাচুর্য আমাদেরকে বিশেষভাবে আশংকিত করে। একটি হলো মানুষের এবং অন্যটি হলো মোটরযানের। নগরীতে বায়ু-দূষণের জন্য এককভাবে সর্বোচ্চ দায়িত্ব এর মোটরযানগুলোর। আর এই দূষণ যখন এখানে ঘন হয়ে বাস করা অসংখ্য মানুষের ফুসফুসকে আক্রমণ করে তার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি খুবই খারাপ হতে বাধ্য। আমরা তাই দুটি বিষয় একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই—মোটর যানের ইঞ্জিন আর মানুষের ফুসফুস। প্রথমে মোটরগাড়ির দিকেই তাকানো যাক।

মোটরগাড়ি যে ইঞ্জিনে চলে তা হলো অন্তর্দহন ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের দহন তার শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে একই জায়গায় অভ্যন্তরীণভাবে ঘটে বলেই এই নাম। অধিকাংশ হালকা মোটর যানের ইঞ্জিন চলে পেট্রোলের দ্বারা। পেট্রোলের সূক্ষ্ম কুয়াশা সৃষ্টি করে এতে দহনের জন্য মেশানো হয় বাতাস। এই মেশানোর কাজটি হয় কার্বুরেটরে। পেট্রোলের সবটুকু ভালভাবে দহন হতে এক ভাগ পেট্রোলের সঙ্গে ১৫ ভাগ বাতাস মিশ্রণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই অনুপাতে পেট্রোল আর বাতাস মিশলে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষমতা ইঞ্জিন থেকে পাওয়া যায় না। সেটি পাওয়া যায় আরো বেশি বাতাস ব্যবহার করলে।

সাধারণত স্থির অবস্থা বা কম গতি থেকে বেশি গতিতে যাবার সময় ইঞ্জিন ১ ভাগ পেট্রোলের সঙ্গে ১২ ভাগ বাতাস ব্যবহার করে। ব্রেক কষে থেমে পড়ার সময় অথবা দাঁড়িয়ে থেকে অলসভাবে ইঞ্জিন চালনার সময় বাতাসের ভাগ আরো কমে এসে দাঁড়ায় ১১ ভাগে। অথচ ১৫ ভাগের কম বাতাস হলেই ইঞ্জিনের পরিত্যক্ত গ্যাসে প্রচুর কার্বন মনোক্সাইড আর হাইড্রোকার্বন সৃষ্টি হয়ে মেশে। বায়ু দূষণের জন্য এগুলোর ভূমিকা খুবই বেশি।

নগরীর মোটরগাড়িগুলোর থামা চলার প্যাটার্নের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝবো কেন এখানে জ্বালানির সম্পূর্ণ দহন প্রায় অসম্ভব। একটানা গতিতে গাড়ি চালানো এখানে ক্ষণিকের জন্যও সম্ভব নয়। মোড়ে মোড়ে লাল বাতিতে থামা, দাঁড়িয়ে অলসভাবে ইঞ্জিন চালানো এবং আবার সচল হওয়াতো রয়েছেই—তার উপর রিক্সা আর পথচারীর ভীড় ঠেলে এবং যানজটের ফাঁকে চলতে গিয়ে একটি গাড়িকে অসংখ্য বার

গতিবেগ পরিবর্তন করতে হচ্ছে, ব্রেক কষতে হচ্ছে। এ সবই ইঞ্জিনে পেট্রোল-বাতাসের মিশ্রণে বাতাসের ভাগ কমিয়ে দূষণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে অনেকখানি। এক ভাগ পেট্রোলের সঙ্গে ১৪ ভাগ বাতাস থাকলে যে পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড ইঞ্জিনে সৃষ্টি হয়, ১২ ভাগ বাতাস থাকলে তার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে প্রায় তিন গুণ।

নগরীর রাস্তায় আর যে ধরনের অন্তর্দহন ইঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তা হলো ডিজেল ইঞ্জিন। এতে জ্বালানি আর বাতাস মেশাবার জন্য কার্বুরেটর থাকে না। যত প্রয়োজন তত বাতাস অবাধে সরবরাহ করা হয়। একই সঙ্গে জ্বালানিকেও সরাসরি ঢুকিয়ে দেয়া হয় দহন কক্ষে। বাতাস প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানির অপরিপূর্ণ দহন হবার কথা নয়। কিন্তু সেটি আদর্শ অবস্থা। আমাদের নগরীতে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় প্রধানত বাস, ট্রাক, জীপ, মাইক্রোবাস এবং টেম্পোতে। এর প্রত্যেকটিরই খ্যাতি রয়েছে—ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা বহনের। ডিজেল ইঞ্জিনকে যদি সঠিক পদ্ধতিতে চালানো না হয় এবং এর উপর যদি ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয় তাহলে এটি পেট্রোলের ইঞ্জিনের চেয়ে বরং অধিকতর দূষণ সৃষ্টিকারী হয়ে দাঁড়ায়। ডিজেল চালিত যানবাহনগুলো ব্যবসায়িক কাজে রত বলে এদের বেপরোয়াভাবে বোঝাই করার এবং চালানোর প্রবণতা ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে তোলে। ডিজেল ইঞ্জিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর কার্যকারিতার উত্তাপ অপেক্ষাকৃত বেশি। এই অধিকতর উত্তাপে ইঞ্জিনের মধ্যে সহজে নাইট্রোজেন অক্সাইড গঠিত হতে পারে। দূষণকারী হিসাবে নাইট্রোজেন অক্সাইডের প্রভাবও খুবই বিষময়।

বায়ু দুষণে মোটরগাড়ির অবদান একেবারে প্রত্যক্ষ এবং সরাসরি। শহরের ব্যস্ত কোন সড়কে প্রতি ঘণ্টায় কতগুলো মোটর যান অতিক্রম করছে আর ওখানে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত তা পরিমাপ করলে ব্যাপারটি নাটকীয়ভাবে ধরা পড়ে। পাশ্চাত্যের একটি বড় নগরে এমনি একটি পরীক্ষায় দেখা যায় মধ্যরাতের পর থেকে ভোর রাত পর্যন্ত যানবাহনও খুব কম, কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণও সামান্য। ভোর ছটার পর থেকে উভয়েই প্রায় একই গতিতে বেড়ে উঠছে আর আটটা থেকে দশটার মধ্যে অফিস গামী ট্রাফিক জ্যামের সঙ্গে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে অনেক উঁচুতে এবং রাত আটটা পর্যন্ত সেটি ঐ উঁচুতেই স্থির থাকছে। দিনের বিভিন্ন সময়ে যানবাহনের পরিমাণ এবং কার্বন মানোক্সাইডের পরিমাণের লেখচিত্র দেখলে মনে হয় যেন এরা একই চিত্র, একটি জানলে অন্যটিও জানা হয়ে যায়।

কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রো কার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড এ কয়েকটি বিষময় দূষণ পদার্থের বড় উৎস নগরীর মোটর যানগুলো। আজ অনেক নগরীতেই বায়ু দূষণের শতকরা নব্বই ভাগের জন্যই এদেরকে দায়ী করা যায়। অথচ ভাগ্যের পরিহাস, প্রথম যখন মোটরগাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন একে এক ধরনের পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সে সময় দুনিয়ার সব বড় বড় শহরে যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হত প্রচুর ঘোড়া। ঘোড়া সেভাবে বায়ু দূষণ করতো না বটে তবে ঘোড়ার গোবরের যন্ত্রণায় নগরবাসী অতিষ্ঠ ছিল। এক নিউইয়র্ক শহরের পরিবেশকেই সে সময় দৈনিক পঁচিশ লক্ষ পাউন্ড ঘোড়ার গোবরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু আজকের সমস্যার তুলনায় সেটি বোধ হয় অনেক সহজ সমস্যা ছিল।

# গাড়ি নিয়ে কি করি

নগরীতে বায়ু দূষণের জন্য মোটরযানগুলোই যে প্রধানত দায়ী এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবার পর থেকেই নানা দেশে চিন্তা ভাবনা চলছে এ নিয়ে কি করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং আর্থিক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে যে-কোন নগরে মোটরযানের সংখ্যা বেড়েই চলবে এটিই স্বাভাবিক। অত্যধিক বায়ু দূষণ এর অবশ্যম্ভাবী ফল। শুধু তাই নয়, শব্দ দূষণ, যানজটের অসহনীয়তা, গাড়ি পার্ক করার জন্য প্রচণ্ড চাপ—এসবও নগরীর সার্বিক পরিবেশে অবনতি ঘটাতে বাধ্য।

এসব দিকে লক্ষ্য রেখে পৃথিবীর বড় বড় কিছু নগরীতে সময় সময় গাড়ির সংখ্যা কমাবার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। গাড়ি মালিকরা যেন শহরের মধ্যে গাড়ি চালাতে কম উৎসাহিত হন সেজন্য প্রচুর ভাল সস্তা বাস সার্ভিস রাখার আয়োজন হয়েছে। কোন কোন নগরীতে তো বাসের ভাড়া একেবারেই তুলে দেবার পরীক্ষাও চলেছে। গাড়ির বদলে বাসকে উৎসাহিত করার কারণ হলো তাতে জনপ্রতি দূষণ দৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে অনেকখানি। বাসগুলো যদি অন্তর্দহন ইঞ্জিনের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত হয়, ট্রিটকারের মত তাহলে এর থেকে বায়ু দূষণ একেবারেই হবে না। অবশ্য শহরের ভেতরের না হলেও বিদ্যুৎ যে পাওয়ার স্টেশনে তৈরি হচ্ছে সেখানে বায়ু দূষণের সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

গাড়ির সংখ্যা সীমিত করার চেষ্টা করে হয়তো দূষণ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কিন্তু মোটরগাড়ির ইঞ্জিন যতদিন দূষণের একটি প্রধান উৎস থাকবে ততদিন বড় কোন উন্নতি আশা করা যায় না এক্ষেত্রে। গাড়ি উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলোতে এদিক থেকেও চেষ্টা চলছে—গাড়ি যেন দূষণ কম করে। পরিবেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মোটরগাড়ি তৈরিকে অনেকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

গবেষণা চলছে কেমন করে মোটরগাড়ির ইঞ্জিনকে সব সময় এর সর্বোচ্চ দক্ষতায় রেখে চালানো যায়। অর্থাৎ জ্বালানির যথাসম্ভব সর্বাধিক অংশই যেন এখানে দহনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনে ব্যয়িত হয়ে যায়, ক্ষতিকর নানা উপজাত গ্যাস সৃষ্টির সুযোগ যেন না পায়।

মোটরগাড়ির ইঞ্জিন থেকে অদহিত জ্বালানির প্রধান অংশটি এক্সস্ট পাইপ দিয়ে নানা উপজাত গ্যাসের আকারে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এর আর একটি অংশ আছে যেটি চাপে থাকা পিস্টনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে ইঞ্জিনের কেইসিং বা আচ্ছাদন বাক্সের ভেতরে যায় এবং পরে একটি নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। গরম কার্বুরেটর থেকে বাষ্পীভূত হয়েও কিছু জ্বালানি বাষ্প বেরুতে থাকে। দূষণে এদেরও অবদান রয়েছে। পিস্টনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অদহিত জ্বালানি গ্যাসকে যেন আবার ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যেই ফেরত পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা এখন হচ্ছে। তাতে এটি দূষণ বস্তু হিসাবে বেরিয়ে আসার বদলে বরং জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগবে পুনর্বার দহনের মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হলো মোটরগাড়ির প্রথম যুগে এই ব্যবস্থা ছিল, জ্বালানির অপচয় রোধের জন্য। পরে এটি বাদ দেয়া হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা মনে করে। এখন আমরা সাগ্রহে একে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি পরিবেশ বন্ধু হবার আশায়।

এক্সস্ট পাইপ থেকে নিঃসরিত গ্যাসকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত করার জন্য অনুঘটক রূপান্তরক নামে একটি ব্যবস্থা এখন চালু হচ্ছে। বেরিয়ে আসার সাথে গ্যাসগুলো এই রূপান্তরকের মধ্যে হয়ে আসবে। এখানে থাকবে অনুঘটকের একটি স্তর। রসায়নে অনুঘটক হলো সেই বস্তু যা নিজে স্বল্প পরিমাণে থেকে এবং বিক্রিয়ায় স্থায়ীভাব অংশ না নিয়ে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুত ভালভাবে সংঘটিত হতে সাহায্য করে। বাতাসের সাথে মিশ্রিত হবার পর রূপান্তরকের মধ্যে এক্সস্ট গ্যাসগুলো অনুঘটকের সাহায্য দক্ষভাবে নির্দোষ অক্সাইডে পরিণত হতে পারে। অনুঘটকের কল্যাণে বিক্রিয়াগুলো সাধারণত যে উচ্চ তাপমাত্রায় হবার কথা তার চেয়ে অনেক কম তাপমাত্রায় ঘটতে পারে। এর ফল হলো ভালভাবে অক্সিডেশন হচ্ছে অথচ উচ্চ তাপমাত্রায় উৎপন্ন বিষাক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টির সম্ভাবনা এতে থাকে না। বিশ্বের কোন কোন অঞ্চলে মোটরগাড়ির সঙ্গে এই অনুঘটক রূপান্তরক ব্যবহার ইতোমধ্যেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শুধু নিঃসরিত গ্যাসের একটি বিহিত করার মাধ্যমেই নয়, পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নত নতুন ধরনের ইঞ্জিন উদ্ভাবন নিয়েও গবেষণা চলছে। ইঞ্জিনের কার্বুরেটরের গঠনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কার্বুরেটর হচ্ছে ইঞ্জিনের সেই অংশ যেখানে বাতাস আর জ্বালানি মেশানো হয়। পরিবর্তিত কার্বুরেটরে আরো অধিক বাতাস জ্বালানির সঙ্গে মেশানো যাবে। বাতাস আর জ্বালানির অনুপাত বাড়িয়ে অদহিত জ্বালানি থাকার সম্ভাবনা কমানো যাবে। আর এক ধরনের পরিবর্তনে ইঞ্জিনের যে অংশে দহনের পর বর্জ্য গ্যাস বের হয়ে আসে সেখানে সজোরে বাতাস ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে উত্তপ্ত বর্জ্য গ্যাসের আরো কিছু অক্সিডেশন হবার সুযোগ থাকবে। নতুন ধরনের ইঞ্জিনের কার্বুরেটর এবং জ্বালানি ট্যাংকের সংগে এক ধরনের গ্যাস-শোষক দেয়া থাকবে। জ্বালানি বাষ্প-এর তলে এড্সর্পশন পদ্ধতিতে শোষিত হবে, বাইরে গিয়ে দূষণ ঘটাতে পারবে না।

আরো বড় ধরনের একটি পরিবর্তন হতে পারে—স্তরীভূত জ্বালানি-মিশ্রণ ব্যবহারে মাধ্যমে। সাধারণত যে মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় তাতে বাতাস আর জ্বালানির অনুপাত

এমন যে দূষণ বেশি হয়। যদি অনেক বেশি বাতাস ব্যবহার করা যেত তাহলে এমনটি হত না। কিন্তু অনেক বাতাসে স্বল্প জ্বালানির এ রকম পাতলা মিশ্রণে আগুন ধরানো সহজ নয়। ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের মধ্যে যে স্পার্ক প্লাগ রয়েছে তার কাজ হলো ছোট্ট বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে জ্বালানি মিশ্রণে আগুন ধরিয়ে দেয়া। এভাবে আগুন ধরাতে স্বাভাবিক ঘন মিশ্রণ চাই। তাই পরিবর্তিত ইঞ্জিনে একটি দহন-পূর্ব প্রকোষ্ঠে স্বাভাবিক ঘন মিশ্রণে প্রথমে আগুন ধরানো হবে, পরে এই আগুন কাজে লাগবে আসল প্রকোষ্ঠে পাতলা মিশ্রণকে জ্বালাতে। জ্বালানি মিশ্রণ ঘন থেকে পাতলা—এভাবে স্তরীভূত থাকে বলেই এ পদ্ধতির নাম স্তরীভূত জ্বালানি মিশ্রণ। অধিকাংশ জ্বালানি পাতলাভাবে ব্যবহৃত হবে বলে এতে দূষণ কম হবে।

মোটরগাড়িতে একেবারে নতুন ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহারের কথাও ভাবা হচ্ছে। এমনকি এটি হতে পারে ওয়ানকেল রোটারী ইঞ্জিন। এতে সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের আসা যাওয়া নেই, বরং ত্রিকোণ একটি ঘুরন্ত অংশ দহন প্রকোষ্ঠের ভেতর ঘুরতে ঘুরতেই দহন-চক্রের চারটি পর্যায় সম্পন্ন করে। ইঞ্জিনের চলন্ত অংশের পরিমাণ এতে কম, সম্পূর্ণ দহনের সুযোগও বেশি। হয়তো-বা একদিন মোটরগাড়িতে একে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বড়কথা হলো দূষণের উৎস হিসাবে মোটরগাড়ির যে দুর্ণাম তা ঘুচাবার জন্য প্রচুর সচেতনতা ও চেষ্টার সৃষ্টি হয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে যতটুকু পারি তা করবো না কেন!

# ফুসফুস এখন যার দখলে

নগরীর বায়ু দূষণের অনেক কুফল আমাদের পারিপার্শ্বিকতার উপর ঘটছে। তবে আমাদের জন্য সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হলো শরীর-স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব। এখন এটিই আমরা একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই। যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ আমাদের চলছেই। প্রতি নিঃশ্বাসে যে বাতাস আমরা টেনে নিচ্ছি তার কি হচ্ছে দেখা যাক।

নাকের মধ্য দিয়ে যখন বাতাস টেনে নেয়া হয় তা নাসারন্ধ্রের ভেতর উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা লাভ করে। ট্রাকিয়া বায়ুনলের মাধ্যমে এ বাতাস ফুসফুসের কাছে গিয়ে দুই ফুসফুসে দুটি ব্রঙ্কিয়াল টিউব হিসাবে প্রবেশ করে। এগুলো ফুসফুসের মধ্যে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হতে হতে সূক্ষ্ম ব্রাঙ্কিয়ালে গিয়ে পৌঁছে। প্রতিটি ব্রঙ্কিয়ালে নালিকার অগ্রভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুর থলে রয়েছে—যেগুলোকে বলা হয় এলভিয়োলী। এ সব থলে চারদিকে রক্তের কৈশিক নালীর জালে বেষ্টিত থাকে। এদের পাতলা পর্দার মধ্য দিয়ে রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিনিময় ঘটে। নিঃশ্বাস নেবার উদ্দেশ্যটাই এখানে।

শ্বাসতন্ত্রের কিছু স্বাভাবিক নিরাপত্তা রয়েছে, বিজাতীয় বস্তু যাতে এখানে বাতাসের সঙ্গে ঢুকতে না পারে। নাসারন্ধ্রের ভেতর যে লোম থাকে তা অপেক্ষাকৃত বড় ধূলিকণা ওখানেই আটকিয়ে ফেলে একটি ছাকনীর মত কাজ করে। আবার নাসাগহ্বর থেকে শুরু করে ব্রঙ্কিয়াল টিউব পর্যন্ত সব জায়গায় নালীর ভেতরের দেয়ালে শ্লেষ্মাময় ঝিল্লীর আস্তরণ থাকে। এখান থেকে তরল শ্লেষ্মা নিঃসরিত হয়। বাতাসের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বিজাতীয় কণিকাগুলো এই শ্লেষ্মায় আটকা পড়ে। পরে সূক্ষ্ম লোম সদৃশ সিলিয়ার দ্বারা ঝেটিয়ে এগুলোকে বের করে দেয়া হয়।

এভাবে শ্বাসতন্ত্রের বিজাতীয় কণিকার বিরুদ্ধে কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও মুশকিল বাধে বাতাসে বিজাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে। এগুলো ফুসফুসের একেবারে সংবেদী প্রান্তে গিয়ে পৌছে অনর্থ বাধাতে পারে। শুধু তাই নয়, সালফার ডাই-অক্সাইডের মত কিছু কিছু দূষণ গ্যাস বায়ু নলের সিলিয়াগুলোকে আক্রমণ করে

তাদেরকে খানিকটা নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এতে ফুসফুস কণিকার বিরুদ্ধেও অসহায় হয়ে পড়ে।

নিঃশ্বাসের বাতাসে দূষণ পদার্থ কাশির সৃষ্টি করে, অতিরিক্ত শ্লেষ্মার নিঃসরণ ঘটায় এবং বায়ু নালীতে সংকোচন ঘটিয়ে বাতাসের প্রবাহকে বাধা দেয়। ব্রঙ্কিয়াল টিউবে এভাবে প্রদাহের সৃষ্টি হয়ে ব্রঙ্কাইটিসের সূচনা করে। বিভিন্ন দূষণ বস্তুতে এলার্জির মাধ্যমে এটি হলে সেটি দেখা দেয় হাঁপানী রূপে।

ফুসফুসের ক্ষুদ্র বায়ুথলিগুলো খুবই নাজুক ও স্পঞ্জ সদৃশ্য কোষ কলায় তৈরি। এখানে প্রদাহ ঘটলে তার প্রতিক্রিয়ায় রক্তের জলীয় অংশ দেয়ালের মধ্য দিয়ে এসব থলিতে এসে জমে। এভাবে এলভিয়োলীগুলোতে পানি দেখা দিলে বাতাসের জন্য জায়গার অভাব হয় এবং ফুসফুসের অতি জরুরী কাজটি ব্যাহত হয়।

আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এলভিয়োলীগুলো যতখানি প্রসারিত ও সংকুচিত হবার কথা দূষণজনিত প্রদাহের ফলে তা করতে না পারলে আগের কিছু বাতাস এর মধ্যে থেকে যায়। সে অবস্থায় এরা আকারে বড় হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ফেটেও যেতে পারে। কয়েকটি এলভিয়োলী ফেটে এক একটি বড় থলিতে পরিণত হতে পারে। এমনটি হলে ঘন ঘন ছোট শ্বাস নেবার প্রবণতা দেখা দেয়। বিভিন্ন ব্যস্ত নগরীতে বায়ু দূষণ যত বাড়ছে এ রকম বক্ষব্যাধি ততই বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

দূষণ বস্তুর ফলে সৃষ্ট এসব অবস্থায় একটি ব্যাপার ঘটে তা হলো রক্তে অক্সিজেন যোগানে বিপত্তি। শরীরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতা হয় ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা। রক্ত সঞ্চালন বাড়তে গিয়ে হার্টের উপর চাপ পড়ে। এভাবে বায়ু দূষণ পরিণামে পরোক্ষভাবে হার্টের অসুখের কারণ ঘটায়।

শরীরে অক্সিজেনের অভাব হলে কি রকম লাগতে পারে তা আমরা কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলেই টের পাই। মাথা ঘোরা মাথা হালকা বোধ হওয়া এর নিত্য অনুসঙ্গ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন মনোঅক্সাইড টেনে নিলেও অক্সিজেন ঘাটতির সৃষ্টি হয়। কার্বন মনোঅক্সাইড রক্তে অক্সিজেনের জায়গা দখল করে। ফলে কোষ কলায় পৌছানো অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। আরো বিপদ হলো রক্তের হেমোগ্লোবিনে অক্সিজেন এবং কার্বন মনোক্সাইড প্রায় একইভাবে মিশলেও কার্বন মনোক্সাইডের প্রতি হেমোগ্লোবিনের আকর্ষণ অক্সিজেনের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি। কাজেই বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড অপেক্ষাকৃত অল্প থাকলেও তারই দাপট হয় বেশি।

বাতাসে স্বল্প পরিমাণ দূষণ বস্তুর পরিমাণ সাধারণত মাপা হয় পি. পি. এম. অর্থাৎ পার্ট পার মিলিয়ন এই এককে। এক পি. পি. এম. মানে হলো এক মিলিয়ন ভাগ আয়তনের বাতাসে ঐ দূষণ বস্তু রয়েছে এক ভাগ আয়তন পরিমাণে। স্পষ্টত এটি অতি স্বল্প একটি পরিমাণ। অথচ যে বাতাসে মাত্র ১০ পি. পি. এম. কার্বন মনোক্সাইড রয়েছে তাতে যদি আমরা ৮ ঘণ্টা কাটাই সেটিই মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট। কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যদি ১০০ পি. পি. এম. হয় তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা ধরা আর মাথা ঘোরা দেখা দেয়। অথচ ট্রাফিক জ্যামে যখন

বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে থেকে ইঞ্জিন চালু রাখে তখন সেখানকার বাতাসে ৩০০ পি. পি. এম. কার্বন মনোক্সাইড থাকা নিত্যকার ব্যাপার।

বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি আরো কিছু দূষণ গ্যাস কার্বন মনোক্সাইডের মতই খুব স্বল্প পরিমাণেই যথেষ্ট ক্ষতিকর। নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং ওজোন কম দ্রবণীয় বলে বায়ু নালীর শ্লেষ্মাময় ঝিল্লী এদের আটকাতে পারে না—এরা ফুসফুসের গভীরে ঢুকে পড়ে অনর্থ ঘটায়। সালফার ডাই-অক্সাইডের অধিক দ্রবণীয়তা একে পথের মধ্যে ঝিল্লীতে দ্রবীভূত করে ফেলতে পারে। কিন্তু এটি যখন ধোঁয়াকণা আশ্রিত হয়ে বাতাসে থাকে তখন কিন্তু দ্রবীভূত না হয়ে এটিও ফুসফুসের গভীরে চলে যেতে পারে। কাজেই দূষণ গ্যাসের সঙ্গে কালো করে থাকা ধোঁয়াকণার উপস্থিতি ব্যাপারটি আরো গুরুতর করে তোলে।

মোটরগাড়ি, কল-কারখানা এসবের বায়ু দূষণ সার্বজনীন ও ব্যাপক আকারের। কিন্তু একই রকম আর একটি দূষণ হলো অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত—সেটি ধূমপানের ফলে ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়া টেনে নেবার সময় এর সঙ্গে ধোঁয়াকণা, টার, নিকোটিন এবং নানা রকম বিজাতীয় গ্যাস ফুসফুসে গিয়ে ঢোকে। এদের ক্ষতি একই রকমের বরং ঘনত্বে আরো বেশি। বাতাসে মনোক্সাইডের নিরাপদ মাত্রা হলো ১৫ পি. পি. এম.। অথচ সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্য স্রোতে যে বাতাস সেখানে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ এই নিরাপদ মাত্রার আড়াই হাজার গুণ। এর অর্থ হলো নিয়মিত যারা ধূমপান করে তাদের রক্তের শতকরা দশ ভাগের মত হেমোগ্লোবিন অক্সিজেন যোগানের কাজ করতে ব্যর্থ হয়। একজন ধূমপায়ী তাঁর আশপাশের সবার জন্যও বাতাসকে এভাবে দূষিত করে তুলছেন। ক্যান্সার সৃষ্টি ইত্যাদির সম্ভাবনা বাদ দিলেও শুধু উল্লেখিত সুস্পষ্ট কারণগুলোর জন্যই ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

# এসিড পড়ে টাপুর টুপুর

এসিড বৃষ্টি নামটি শুনলেই মনে আতংক উপস্থিত হবার কথা। এসিড জিনিসটাকে এমনিতেই আমরা ভীষণ ভয় করি। ধাতুর মত শক্ত সমর্থ জিনিসকেও ক্ষয়ে ফেলা এর স্বভাব। আর এটি বৃষ্টির মত আমাদের গায়ে ঝরবে তাহলে তো বাঁচাই দায়। আসলে বিষয়টি তেমন তাৎক্ষণিকভাবে ভয়ংকর কিছু নয়। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিটা নেহাৎ কমও নয়। নগরীর পরিবেশ অবনতির একটি চরম চিত্র হতে পারে এই এসিড বৃষ্টি।

নগর থেকে দূরে নিভৃত পল্লীর উপর যে বৃষ্টি হয় তার এসিড বা ক্ষারীয় গুণ পরিমাপ করলে দেখা যায়—এসিড বা ক্ষার কোন দিকেই তার তেমন প্রাধান্য নেই। বড় জোর অতি মৃদু একটু এসিডের ভাব থাকতে পারে জলীয় বাষ্পে এমোনিয়াম কার্বনেট সামান্য থাকে বলে। কিন্তু এই পরিমাপটি বড় বড় অনেক নগরীতে চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে বৃষ্টিতে এসিড ভাব আশংকাজনকভাবে বেশি। এমন পার্থক্যের কারণ কি? এর জন্য দায়ী নগরীর বায়ু দূষণ।

মোটরগাড়ির ধোঁয়া আর শিল্প কারখানায় তেল-কয়লা পোড়া ধোঁয়া থেকে নগরীর বাতাস গিয়ে মিশছে প্রচুর সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড। এগুলো সালফেট ও নাইট্রেট হয়ে বাতাসের জলীয় বাষ্পে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড রূপে দ্রবীভূত হয়। ঐ জলীয় বাষ্প যখন পরে ঘন হয়ে বৃষ্টি রূপে নামে তখন সে বৃষ্টির এসিড ভাব হয় অনেক বেশি। এমন বর্ষণকেই আমরা বলছি এসিড বৃষ্টি।

প্রশ্ন হলো ঢাকা নগর এবং তার আনাচ কানাচ থেকে যে দূষিত ধোঁয়া বাতাসে যাচ্ছে, তার ফলে যে এসিড বৃষ্টি তা কি নগরীর উপরেই হবে? এর উত্তর কখনো হ্যাঁ, কখনো না। এটি নির্ভর করবে আবহাওয়ার নানা বিষয়ের উপর। বায়ু স্রোতের উচ্চতা ও বিন্যাস এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই অনুসারে বাতাসে সৃষ্ট এসিড স্থানীয় বৃষ্টিতে ঝরতে পারে, আবার বহুশত কিলোমিটার দূরে গিয়েও ঝরতে পারে। তবে দূষণ যেখানে ঘন হয়ে আছে সেখানকার উপরেই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দায়ী, নগরীই আবার এর প্রধান ভুক্তভোগী।

আমাদের নগরীর জন্য এসিড বৃষ্টি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য নেই। কিন্তু গাড়ির ধোঁয়া আর কল-কারখানার ধোঁয়া থেকে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সাইড আর সালফার ডাই-অক্সাইড অনবরত বাতাসে মিশছে, আর এ মাত্রা যে হারে বাড়ছে, তাতে এ সম্পর্কে আশ্বস্ত থাকার কোন কারণ নেই। এসিড বৃষ্টির ধীরে ধীরে কিন্তু অবধারিতভাবে তার ক্ষতি করে চলে।

পানি, গাছগাছড়া, প্রাণী জীবন সবকিছুর উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। আমাদের দেশে এ প্রভাবগুলো পরীক্ষিত না হলেও সচেতন বিশ্বের অনেক জায়গাতেই রয়েছে। পানির উৎসগুলোকে অতিরিক্ত এসিড ভাবাপন্ন করে তুলতে পারে এসিড বৃষ্টির বর্ষণ। এটি এমনিতেই উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের জন্য ক্ষতিকর। তার উপর এসিড পানিতে কিছু ধাতব আয়নের মত বিষময় জিনিস সহজে দ্রবীভূত থাকতে পারে। এদের ক্ষতিকর দিকটিও কম নয়। শিল্পোন্নত উত্তর আমেরিকা আর উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বিস্তীর্ণ জায়গায় অসংখ্য নদ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের মারাত্মক দূষণ ও মৎস্যহানির জন্য এসিড বৃষ্টিকে দায়ী করা হচ্ছে।

পশ্চিম জার্মানির কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতরের মতে সেখানে এসিড বৃষ্টির ফলে শুধু যে অনেক গাছপালার বৃদ্ধির হার কমে যাচ্ছে তাই নয়, অনেক বনাঞ্চল রীতিমত লোপ পেতে বসেছে। ইউরোপে আপেল, পীচ, স্প্রুস, পাইন ইত্যাদি গাছের উপর এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর ফল প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের গাছপালার উপর পরীক্ষা চলালে হয়তো এই ফল পাওয়া যেত। আমাদের ক্রমবিলীয়মান বনাঞ্চলের উপর যদি অতিরিক্ত এই এসিড বৃষ্টির উপাদানটিও যোগ হয়ে থাকে তাহলে অবস্থা ভবিষ্যতে আরো খারাপ হয়ে পড়তে পারে। একটি ভাল খবর এই যে, প্রধান শস্যসমূহের উপর এসিড বৃষ্টির তেমন কোন কু-প্রভাব স্পষ্ট হয়নি।

মানুষের দেহে এসিড বৃষ্টির সরাসরি প্রভাবগুলো এখনো পরিষ্কার বোঝা যায়নি। তবে এক্ষেত্রে এসিড বৃষ্টির চেয়ে এসিড কুয়াশার প্রভাবই বেশি। এসিড যুক্ত জলীয় বাষ্প যখন কুয়াশা তৈরি করে তখন তা সহজেই নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে চলে যেতে পারে।

এসিড বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি নগরীতে আরো একদিকে থেকে আসতে পারে। তা হলো এর ইমারত ও অন্যান্য স্থাপত্যের উপর ক্রমাগত এসিড বৃষ্টি এদেরকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলতে পারে। পরিণামে এদের সৌন্দর্য ও গড়ন উভয়েই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিছু দিন আগে, ভারতে আগ্রার কাছে মাথুরার তেল শোধনাগার থেকে দূষিত এসিড বৃষ্টি তাজমহলকে ক্ষতি করার উপক্রম করলে ঐ শোধনাগারটি সরিয়ে দিতে হয়। নগরীতে মোটরগাড়ির লাগামহীন ধূসর উদ্গীরণ আর যত্রতত্র কল-কারখানার যেনতেন জ্বালানি ব্যবহার বাতাসে বিষময় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রচুর নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড বাড়াচ্ছে। এ গ্যাসগুলোর প্রত্যক্ষ মারাত্মক প্রভাব তো রয়েছেই আবার বৃষ্টির এসিড হিসাবে ফিরে এসে আরো দুর্ভোগ সৃষ্টির সুযোগ এদের থাকে। উভয় প্রকার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার উপায় হলো এ ভাবে বায়ু দূষণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। পরিবেশ সচেতন দেশগুলো ইতোমধ্যেই ধোঁয়াকে এসব

দোষমুক্ত করার জন্য ছাকনীর ব্যবস্থা করেছে যা উদ্গীরণের আগেই ধোঁয়া থেকে দূষণ গ্যাসগুলো সরিয়ে ফেলতে পারে। এভাবে এসিড বৃষ্টিরও একটি সুরাহা হতে পারে। এমন কি জ্বালানিতে সালফারের ভাগ কমাবার জন্যও ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা যদি এ সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকি অথচ দূষণের উৎসগুলো বাড়িয়ে চলি, তাহলে পরিবেশ একদিন আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে।

পানির উৎসগুলোর উপর এসিড বৃষ্টির কুফল কমাবার জন্য অনেক দেশে নানা জলাশয়ে পানির সঙ্গে চুন মেশাবার রীতি প্রচলিত হয়েছে। চুনের ক্ষারীয় গুণ আছে বলে এটি পানির এসিড ভাব দূর করতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো নগরীর বায়ু দূষণের উপর কড়া নজর রাখা। বাতাসে কি ঘটছে তা সূক্ষ্ম পরিমাপ ছাড়া বলা মুশকিল। যেসব নানা পদ্ধতি এর জন্য রয়েছে তার অধিকাংশই যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। তবে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত কম খরচে সিক্ত-রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এতে বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণের মধ্য দিয়ে দূষিত বাতাসকে চালনা করা হয়। একটি বিশেষ দ্রবণ একটি নির্দিষ্ট দূষণ গ্যাসের অস্তিত্ব ও পরিমাপ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।

আমাদের নগরীর বাতাসকে চোখের সামনে দূষিত হতে দেখেও আমরা দীর্ঘকাল নির্বিকার ছিলাম। নগরীর উপর বর্ষিত বৃষ্টিও যে কতখানি নির্দোষ বারি সে সম্পর্কেও এখন আমাদের খোঁজ-খবর করা অতি জরুরী হয়ে পড়েছে।

# প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনিং

পরিবেশের সঙ্গে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ আর অতি নিত্য যে সংযোগ তাহলো বাতাসের মাধ্যমে। বাতাসে আমরা ডুবে আছি, আর দমে দমে সে বাতাস টেনে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি শরীরের গভীরে। তাই স্পষ্টত যে দূষণ বাতাসকে প্রভাবিত করছে শুধু সে কথা চিন্তা না করে বায়ুমণ্ডলের পুরো ব্যাপারটিই আমাদের বোঝার চিন্তা করতে হবে। এ বায়ুমণ্ডল নানাভাবে আমাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

যদিও বাতাস বিস্তৃত রয়েছে পৃথিবীর অনেকখানি উপরে পর্যন্ত তবুও এর নব্বই শতাংশই রয়ে গেছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দশ মাইল উচ্চতার মধ্যে। আর যে বাতাস আমাদের পরিবেশকে বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে তা আছে এরও নিচের দিকের স্তরেই। অবশ্য অনেক উপরে ঊর্ধ্বাকাশেরও কিছু কিছু ঘটনা আমাদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

বাতাসে অনেক ধরনের জিনিস রয়েছে। যেসব জিনিসের উপস্থিতি নিয়ে দূষণের দিক থেকে আমরা সব সময় আশংকিত থাকছি সেগুলো বাতাসের অতি সামান্য ভাগ। প্রধান দুটি গ্যাস—নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনই বাতাসের নিরানব্বই শতাংশ দখল করে আছে। এর ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর ২১ ভাগ অক্সিজেন। বাকি যে এক ভাগ তারও সিংহভাগ হলো দুটি গ্যাস আরগন আর কার্বন ডাই-অক্সাইড। অন্যান্য বহু রকম গ্যাস ইত্যাদির জন্য বাকি থাকে অতি সামান্য ভগ্নাংশ, অথচ বিপদের আশংকা প্রধানত এখান থেকেই। কারণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা প্রায়ই স্থানীয়ভাবে এই সামান্যকে বড় করে তুলে বিপদ ডেকে আনছি। অনেক সময় ব্যাপারটি স্থানীয় থাকছে না। বায়ুমণ্ডলের উপর আমরা এমন হামলা করছি যে সেটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য এমনকি পৃথিবীর জীবনযাত্রার জন্য দারুণ হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রধান গ্যাসগুলো ছাড়া বাতাসে আর কি জিনিস খানিকটা প্রাধান্য পাবে তারও প্রাকৃতিক কিছু কারণ কখনো কখনো থাকে। সমুদ্রের কাছাকাছি বাতাসে ক্ষুদ্র লবণ কণার আধিক্য থাকে। আবার বিস্তীর্ণ এদো জলার কাছাকাছি বাতাসে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে। পানি জমে থাকা ধান চাষের জমির ক্ষেত্রেও এই মিথেন গ্যাসের পরিমাণ বেশি থাকতে পারে।

তবে ভূ-পৃষ্ঠে জীবনের উপস্থিতি বাতাসের এই সাধারণ অবস্থাকে অনেকখানি পরিবর্তিত করে দিতে পারে—বিশেষ করে আধুনিক মানুষের ঘনবসতির জীবন-যাত্রা। আমরা প্রতিটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কমিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাগ বড়িয়ে তুলছি। এখানে সহায় হচ্ছে—গাছপালা। উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে শর্করা খাবার তৈরির জন্য ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। এ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসাবে তৈরি হয় অক্সিজেন। কাজেই উদ্ভিদের উপস্থিতি বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বাতাসের সঙ্গে যে যোগাযোগ সেটি আমাদের জন্য অতি অন্তরঙ্গ এবং প্রত্যক্ষ। কিন্তু পরিবেশের উপর, আমাদের জীবনের উপর বায়ুমণ্ডলের প্রভাব আরো বহুবিধ। বায়ুমণ্ডল আসলে খুবই সচল এবং ঘটনাবহুল একটি সত্তা। আর এই সচলতায় শক্তি যোগায় সূর্য। আসলে আমাদের সবকিছুতেই শক্তির যোগানদার সূর্য। খাদ্য হিসাবে আমাদের নিজেদের শক্তির জ্বালানি যোগাতে সূর্যই ভরসা। নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকেও সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির যে কিয়দংশ বায়ুমণ্ডল পায়, ভূপৃষ্ঠ পায়, আর আমরা পাই, তাই ঘটাচ্ছে অনেক ঘটনা।

বায়ুমণ্ডল সূর্যের শক্তিতে চালিত যেমন হয় তেমনি ভূপৃষ্ঠে আসার আগে এ শক্তিকে তা খানিকটা নিয়ন্ত্রণও করে। বায়ুমণ্ডলহীন পৃথিবীতে সূর্যের বিকিরণের নিচে আমরা বড় অসহায় থাকতাম। আমাদের জীবনকে শক্তি দানে সচল করার বদলে তা বরং হয়ে পড়তো জীবন ধ্বংসকারী এক মারণ বিকিরণে। সূর্যের তেজকে সংযত করে এর ক্ষতিকর অংশকে কমিয়ে ফেলে বায়ুমণ্ডলই একে আমাদের জন্য জীবনদায়ী করে তোলে।

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোর একটি সুন্দর গুণ রয়েছে। এরা সৌর বিকিরণের কোন কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশ বিশেষভাবে শোষণ করে। আবার অন্য কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশকে চলে যেতে দেয়। সূর্য কিরণ এদের মধ্য দিয়ে এসে ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করছে। আবার ভূ-পৃষ্ঠ তার উত্তাপ পূর্ণ বিকিরিত করে দিচ্ছে। কিন্তু এই গ্যাসগুলো বিকিরণের নির্দিষ্ট অংশকে ধরে রেখে তাপের এই আসা-যাওয়াকে সংযত রাখে। তাই ভূ-পৃষ্ঠ মোটের উপর অতিরিক্ত গরমও হয়ে পড়তে পারে না, অতিরিক্ত ঠাণ্ডাও হয়ে পড়তে পারে না। এ যেন এক প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনিং। পরিবেশের বিবেচনায় এটি খুব জরুরী।

# বিষ নিয়ে বাস

জীবনের তাগিদে নগর জীবনে আমাদের এমন অনেক কিছু করে যেতে হয় যেখানে বিষের সঙ্গে আমাদের ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমরা তা টের পাচ্ছি না। নানা রকম মৌল এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে সম্পর্কটি অনেক সময় খুব নাজুক। এক দিক দিয়ে অনেকগুলো বস্তু আছে যেগুলো খুবই স্বল্প মাত্রায় শরীরের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, তামা, দস্তা, কোবাল্ট ইত্যাদি। আবার এমন অনেক বস্তু রয়েছে যেগুলো শরীরের কোন কাজে আসে না, বরং খুব সামান্য পরিমাণেও শরীরে গেলে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সীসা, পারদ, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি এমন কয়েকটি জিনিস। অথচ নাগরিক জীবনে আমাদের আশপাশে এদের উপস্থিতিকে এড়িয়ে চলাও মুস্কিল। আমাদের নগরীর পরিবেশ দূষণে ফসিল জ্বালানি অর্থাৎ তেল কয়লার ভূমিকা যে সবচেয়ে বেশি এটি আজ সবার জানা। এসব পোড়ার ফলে যে দূষণ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এটি হলো ঐ বস্তুগুলোর নিঃসরণ যা খুব স্বল্প পরিমাণে এসেই শরীরের ক্ষতি করতে পারে। সবচেয়ে জ্বলজ্যান্ত উদাহরণটিই নেয়া যাক। মোটরগাড়ির ধোঁয়াতে অনেক কিছুই বিষময় রয়েছে বটে, তবে এর মধ্যে সীসার যে ভাগ রয়েছে নগরীর পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলতে তার দায়িত্ব অনেকখানি। মোটরগাড়ির জন্য সুবিধাজনক পেট্রোল জ্বালানি তৈরি করার জন্য অনেক সময় সীসাঘটিত দ্রব্য এর সঙ্গে মেশানো হয়। বিশেষ করে এন্‌টি নক্‌ বস্তু হিসাবে ট্রেটাইথাইল লেড পেট্রোল মেশাবার রীতি কম বেশি চালু রয়েছে।

গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে নগরীর বায়ুমণ্ডলে অনেকখানি অতিরিক্ত সীসার সৃষ্টি করে এটি। পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, নগরীতে গাড়ি বেশি, পেট্রোলের ব্যবহার বেশি, সেখানে বায়ুমণ্ডলে সীসার পরিমাণও বেশি। মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে অতিরিক্ত সীসা যদি বাতাসে না যেত তাহলে আধুনিক শহরগুলোতে সীসার এ মাত্রা থাকত বর্তমানের মাত্র হাজার ভাগের এক ভাগ। আজ হাজার গুণ বেশি সীসার ঝুঁকি আমাদের নিতে হচ্ছে।

সীসা যে শরীরের কত ক্ষতি করে সেটি আমরা আজ জেনেছি তাও নয়। গ্রীক ও রোমান চিকিৎসকরা সেই প্রাচীন কালেই 'সীসার ব্যথার' কথা বলে গেছেন। রোমানরা

যে সীসার বিষক্রিয়ায় দারুণভাবে ভুগেছে তার বড় কারণ তাদের নগর সভ্যতার অগ্রগতি। তাদের সুন্দর বাড়ি ঘর স্থাপত্যকে চিত্রিত করতে বড় পছন্দ করতো রোমানরা—উজ্জ্বল সব রং দিয়ে। আর এ সব রং তৈরি হত সীসা যৌগ দিয়ে। সকলের অজান্তে বছরের পর বছর ধরে এই সীসা ঝাঁঝরা করে চলেছিল পুরবাসীদের শরীর স্বাস্থ্য।

আজ আমরা অনেক বেশি জানি বটে, কিন্তু সীসার পারিপার্শ্বিকতা থেকে আজও কি আমরা মুক্ত হতে পেরেছি? অল্প কিছু বছর আগেও অধিকাংশ রঙে সীসা থাকত। এখনো সস্তা রঙে, ছাপাখানার কালিতে তা থাকা বিচিত্র নয়। বিশেষ করে বাজে রঙে ছাপা কিছু ঠোঙ্গায় যখন খাবার রাখা হয়, সীসার বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা তখন প্রচুর—বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বড়দের চেয়ে বাচ্চাদের উপর সীসার বিষময় প্রতিক্রিয়া বেশি এবং অনেকটা তাৎক্ষণিক। প্রধানত রঙ দ্রব্য থেকেই তারা এতে আক্রান্ত হয়।

আজ অবশ্য সীসায় আক্রান্ত হবার ভয় নগরীতে সবচেয়ে বেশি বাতাসের দিক থেকে। উন্নত বিশ্বের কোন কোন নগরীতে বাতাসে ভাসমান সীসা কণা মোট ভাসমান পদার্থের শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগেও হতে দেখা গেছে। আমাদের নগরীতেও হয়তা এর পরিমাণ কম হবে না। আরো ভয়ের কথা হলো এই সীসা কণার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি ১ মাইক্রনের চেয়ে ছোট কণিকা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে তা সেখানে থেকে যাবার সম্ভাবনা বেশি। ফুসফুসে জমা সীসাকণা ধীরে সুস্থে সেখানে রক্তের সঙ্গে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ২ মাইক্রনের চেয়ে কণার আকার বড় হলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম যে তাকে ফুসফুসের ঝিল্লী প্রবেশ করতে না দিয়ে বরং বের করে দেবে। কিন্তু হায়, সীসা-বিষাক্ত বায়ুমণ্ডলে তা হবার জো নেই। মোটরগাড়ির ধোঁয়া শুধু বাতাসকেই সীসা বিষাক্ত করে না, মাটিকেও করে। বাতাসের সীসা কণা শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেমে এসে এখানে জমে। এর ফলে দূষণের আরো নতুন নতুন রাস্তার সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য বিষের তুলনায় সীসা দূষণের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদেরকে এ সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকতে সাহায্য করে এবং পরিণামে বিপদ ডেকে আনে। হঠাৎ করে বড় সড় ডোজে সীসা যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়তো তেমন কোন ক্ষতি হবে না, এমনকি সে রকম কোন প্রতিক্রিয়া দেখা নাও যেতে পারে। কিন্তু এই সীসাই যদি প্রত্যহ ধীরে ধীরে একটু একটু করে শরীরে যেতে থাকে তাহলে এটি কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে। মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ শারীর প্রক্রিয়ায় গোলযোগ সৃষ্টি করে এটি চরম অসুস্থতা এবং মৃত্যু ঘটাতে পারে। কাজেই সীসা এমনিতেই দুর্ঘটনা ঘটাবার বিষ হিসাবে এত ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর পরিবেশ দূষণের উপাদান হিসাবে। ধীরে, অলক্ষ্যে, বিশেষ মাধ্যমেই সীসা আমাদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সচেতনভাবে সীসা বা সীসা ঘটিত দ্রব্য দূষণ ঘটাতে পারে এমন বাহক থেকে বাদ না দিলে বিপদ অনিবার্য।

# পরিবেশে পারদ বিষ

সভ্যতার অনিবার্য আনুষঙ্গিক হিসাবে আমাদের পরিবেশ এসেছে এমন সব জিনিস যা খুব সামান্য পরিমাণে এসেও বিষময় ফল দিতে পারে। বাতাসে, পানিতে, সাধারণ ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে স্বল্প মাত্রায় থেকেও এরা জমিয়ে তুলতে পারে বড় মাত্রার ক্ষতির সম্ভাবনা। এর একটি প্রধান কারণ রাসায়নিকভাবে অবক্ষয়িত হয়ে নির্দোষ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এদের কম। তাই মাটিতে, পানিতে এরা যখন জমতে আরম্ভ করে, তখন জমতে জমতে পরিমাণটি বেশ বড় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই বিষময় হবার মত বড় পরিমাণেই এরা আমাদের খাবারের মধ্যেও চলে আসতে পারে।

পাশ্চাত্যের একটি ব্যস্ত নদীপথে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে সেখানকার পানিতে যে সীসা রয়েছে, তা সাধারণ পানিতে গ্রহণযোগ্য পরিমাণের চেয়ে ৬৩ হাজার গুণ বেশি। আর ক্রোমিয়ামের পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ গুণেরও বেশি। এই পানিকে কি কেউ সুস্থ স্বাভাবিক পানি বলতে পারেন? অথচ এর কাছাকাছি বাস করতে হচ্ছে ব্যস্ত নগরীর লক্ষ মানুষকে। আমাদের নগরীর কাছাকাছি জলপথগুলোতে একই রকম পরীক্ষা চালালে কি দেখতে পাব তা আমরা শুধু আন্দাজই করতে পারি।

বিষাক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আছে যেগুলো অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আধুনিকতারই ফসল। তবে অন্য কিছু রয়েছে যেগুলো বহুদিন থেকেই জীবন যাত্রার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে দুটি প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বহুকাল থেকেই পরিচিত—আমাদের দেশেও। এরা হলো সীসা এবং পারদ। অথচ উভয়ের বিষময় প্রক্রিয়ার কথাও বহুদিন ধরে মানুষের জানা। সীসার কথা আগে আলোচিত হয়েছে। আজ পারদের দিকে তাকানো যাক।

বিখ্যাত শিশুতোষ বই এলিস ইন্ ওয়ান্ডার ল্যান্ডে একটি চরিত্র আছে ম্যাড হ্যাটার অর্থাৎ পাগলা টুপীওয়ালা নামে। আসলে 'টুপীওয়ালার মত পাগল' এমন একটি কথা সে আমলে ইউরোপে প্রচলিত ছিল। প্রাণীর পশমকে টুপী বানাবার জন্য নরম করার একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যাতে পারদ যৌগ ব্যবহার করতে হত। ঐ শিল্পের কর্মীদের প্রায়শই মস্তিষ্ক রোগে ভুগতে হত বলেই কথাটি চালু হয়েছিল। আজ আমরা এসব জানি। টুপী তৈরিতে পারদ যৌগ মার্কারী নাইট্রেটের ব্যবহার আর হচ্ছে না একথা

ঠিক। কিন্তু পারদের এতসব ব্যবহার বিশেষ করে নগর জীবনে রয়েছে যা শুধু কোন বিশেষ পেশার মধ্যে নয়, সবাইকে আশংকিত করে তুলতে যথেষ্ট।

আমাদের জন্য পারদের বিপদটি আসে নানা দিক থেকে। চকচকে তরল ধাতু হিসাবেই সাধারণত পারদের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়। ঘরের সাধারণ উষ্ণতাতেই ধাতব পারদের বাষ্প-চাপ যথেষ্ট। অর্থাৎ ঘরে খোলা-মেলা পারদ থাকলেই এর কাছাকাছি জায়গায় পারদের বাষ্প থাকবে যা নিশ্বাসের সঙ্গে দেহে যেতে পারে। বিভিন্ন শিল্পে এবং ছত্রাক-নাশক ওষুধে এখনো নানা রকম পারদ যৌগ ব্যবহৃত হয়। এর বাষ্প বাতাসে পারদের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার ওখান থেকেই দ্রবীভূত পারদ যৌগ মিশছে পানিতে। মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর দেহে এগুলো যায়। পারদের বিপদ হলো জীবদেহে গিয়ে পরিপাক তন্ত্রের মাধ্যমে এটি জীবের কোষ কলায় স্থায়ীভাবে জমতে থকে। এভাবে এটি আমাদের খাদ্যে চেইনের মধ্যে স্থান নিয়ে নেয়। জলজ খাদ্যের সঙ্গে যেমন এটি আসে তেমনি আসে মাটি থেকে ঘাস, শস্য ও পশু মাংসের অংশ হয়ে। কাজেই পরিবেশে পারদের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া আমাদের দেহে পৌঁছার জন্য হাজারো রাস্তা খেলা রয়েছে।

পারদের বিষক্রিয়ার প্রকৃতিটিও বেশ সূক্ষ্ম। এটি শরীরে গিয়ে কোন কোন এনজাইমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। শরীরের বহু অতি পরিমাণে শরীরে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এনজাইমের কাজের উপর নির্ভর করে। খুব স্বল্প পরিমাণে শরীরে ঢুকেই পারদ এরকম বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের উপরেই দেখা দেয় সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব। শুধু তাই নয় গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর এর প্রতিক্রিয়া প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মের কারণ ঘটায়।

শিল্পোন্নত দেশসমূহে যে কয়টি কাজে পারদ কিংবা পারদ যৌগের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি তা হলো ক্লোরিন উৎপাদন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি এবং রং উৎপাদন। অন্যান্য বড় ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনুঘটক, দাঁতের চিকিৎসার সামগ্রী, কৃষিতে ছত্রাক নাশক, ল্যাবরেটরির ব্যবহার, ওষুধ শিল্প, কাগজ ও মণ্ড তৈরি এবং অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে এমালগাম প্রস্তুতি। এ ব্যবহারগুলোর কোন কোনটি আমাদের দেশেও কমবেশি রয়েছে। তা ছাড়া পরিবেশে পারদ বাড়াবার আরো বেশ কিছু উৎস আমাদের চারপাশে চোখে পড়বে।

কয়লার মধ্যে কিছু পারদ রয়েছে। সারা দুনিয়ার হিসাবে কয়লা পোড়ানোর ফলে যে পারদ বাতাসে যায় তা শিল্প বর্জ্য থেকে পরিবেশে যাওয়া মোট পারদের সমান। কাজেই এটি অবহেলা করার মত জিনিস নয় মোটেই। বৈদ্যুতিক ব্যবহারের মধ্যে ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটে এবং তীব্র মার্কারী আলোর বাল্‌বে প্রচুর পরিমাণে পারদ ব্যবহৃত হয়। এগুলোর সঙ্গে নগরজীবনে আমরা নিত্য বাস করছি। নষ্ট হয়ে যাওয়া এসব টিউব ও বাল্ব কোথায় যাচ্ছে সেটি লক্ষ্য করা উচিত। এখনো বেশ কিছু ওষুধ, প্রিজারভেটিভ, লোশন, কসমেটিকে পারদ যৌগ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাগজ ও মণ্ডের প্রস্তুতিতে পারদ যৌগ ব্যবহৃত হতে পারে বলে কাগজ পোড়ানোর মাধ্যমেও পারদ বাতাসে যায়।

সাবান ইত্যাদি তৈরির জন্য প্রচুর কষ্টিক সোডা প্রয়োজন হয়। এই কষ্টিক সোডা তৈরি করতে গিয়ে বড় রকমের একটি পারদ বর্জ্য পরিবেশে মেশে। আমাদের ঘরে, স্কুল-কলেজে এবং অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে ধাতব পারদ আসে থার্মোমিটার প্রভৃতি যন্ত্রপাতির অংশ হিসাবে। ধাতব পারদকে নিয়ে একটি বিপদ হলো কোন রকমে ছিটিয়ে যেতে পারলে এগুলো অনেক ছোট ছোট বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে ঘরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ধুলো বালিতে মিশে পড়তে পারে। পারদ-ভর্তি যন্ত্রপাতি তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। ভেঙে গিয়ে যাতে পারদ না ছিটাতে পারে।

# বালাই নাশের বালাই

দেশে দেশে কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটির ব্যবহার অতি দ্রুতগতিতে বেড়েছে তা হলো রাসায়নিক বালাই নাশক বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাদ্য শস্য ফলাবার চেষ্টার যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে তাকে বালাই নাশকের অত্যন্ত কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা যায়। ১৯৯০ সালে বিশ্বজোড়া বালাই নাশকের বাজার ছিল প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ। আর এর বিশ শতাংশই ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। মোট ব্যবহার তুলনামূলকভাবে এসব দেশে কম হলেও এর বৃদ্ধির হারটি ছিল লক্ষণীয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এ সময় বার্ষিক ২-৪% হারে বালাই নাশকের ব্যবহার বাড়ছিল আর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭-৮% হারে। কৃষি পরিবেশ ও সার্বিক পরিবেশের বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাসায়নিক কীটনাশকের এই বৃদ্ধির হার রীতিমত আশংকাজনক।

রাসায়নিক বালাই নাশক জিনিসটি নতুন কিছু নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আধুনিক রসায়নবিদ্যার একটি ফলশ্রুতি এটি। প্রথম দিকে বালাই নাশক ছিল তামা, পারদ, সীসা, আর্সেনিক ইত্যাদির বিষময় মৌলের রাসায়নিক লবণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক কিছু জৈব যৌগ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। আধুনিককালে এ রকম জৈব যৌগ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হওয়া সম্ভব হলে বালাই নাশকের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হয়। ১৯৩৯ সালে আবিষ্কৃত হয় ডি ডি টি। এরপর অনেকগুলো বছর ডিডিটি চাষের ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে নানা বালাই ও রোগবাহী কীটপতঙ্গ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যাদুর মত কাজ করে। এর অপূর্ব সাফল্য অনুরূপ আরো কিছু যৌগের উপর গবেষণাকে উৎসাহিত করে। ফলে মেথোক্সিক্লোর, বি এইচ সি, অলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিয়েলড্রিন ইত্যাদি একই গোষ্ঠীর অর্গানোক্লোরিন জাতীয় কীটনাশকের আবিষ্কার এ প্রচলন ঘটেছে। পরে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের প্রতি এদের গুরুত্ব ক্ষতিকর দিকগুলো উদ্ঘাটিত হলে ডিডিটি এবং এরকম আরো কয়েকটি কীটনাশকের ব্যবহার অনুচিত বলে ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে অর্গানোফসফেট ও কার্বোনেট জাতীয় কীটনাশকগুলো এখন অধিকতর চালু হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে ফেনিট্রোথিওন, ম্যালাথিওন, ডাইমিথোয়েট ইত্যাদি। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অধিক খাদ্য শস্য ফলাবার প্রচেষ্টায় এসব কীটনাশক একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য উৎপাদনের সঙ্গে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে এ সব বালাই নাশকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

পরিবেশের উপর রাসায়নিক বালাই নাশকের ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্নমুখী। এর কিছু ক্ষতি সরাসরি কৃষি ব্যবস্থার উপরেই। কৃষিতে রোগবালাই, ছত্রাক, জীবাণু, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ইত্যাদির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। এরা কৃষি ব্যবস্থার মতই প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সাধ্যমত এদের নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপরেও নির্ভর করেছে। এর ফলে কৃষি জমিতে পারিবেশিক যে সুস্থিতি বিরাজ করতো সেটি সামান্য নয়। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখত অন্য রকম কিছু কীটপতঙ্গ যারা এগুলো খেয়ে ফেলত। তাছাড়া চাষের জমির উপর কোন কোন পাখি আর জমির পানিতে কোন মাছ ও অন্যান্য মাৎস্য জীবেরও ভূমিকা ছিল অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের দমনে। রাসায়নিক কীটনাশক এসে নাশনের প্রক্রিয়াটিকে আরো মোক্ষম করেছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ঐ প্রাকৃতিক দমনকারীগুলোকেও হয় ধ্বংস নয় বিতাড়িত করেছে। ফলে সেই সযত্নে গড়ে ওঠা পারিবেশিক সুস্থিতি ব্যাহত হয়েছে। এসব একবার ব্যাহত হলে তার পুনসৃষ্টি দুরূহ হয়। প্রাকৃতিক কীট দমনের ব্যবস্থাটির সুযোগ থেকেও এভাবে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ফল হচ্ছে একটাই। আমরা ক্রমে আমাদের কৃষির জন্য আরো বেশি বেশি করে রাসায়নিক বালাই নাশকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। এভাবে নির্ভরশীলতা বাড়ার আরো একটি কারণ রয়েছে। বালাই নাশক যতই ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হোক না কেন ঐ বালাইয়ের উৎস কীটপতঙ্গ, ছত্রাক, জীবাণু, আগাছা—তা যাই হোক না কেন তার মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে অধিক প্রতিরোধী নমুনাগুলোরই বংশধর এবং অনেক ক্ষেত্রে বংশগতভাবে নিজেরাও প্রতিরোধী হয়। ফলে পরের বার বালাই নাশক আর আগের মত কাজ করে না। একে ফলপ্রসূ করতে হলে তার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। নইলে প্রয়োগ করতে হয় আরো কড়া ওষুধ। এভাবে নির্ভরশীলতা ক্রমেই বেড়ে চলে।

পরিবেশের প্রতি বিষময় প্রতিক্রিয়াযুক্ত টনে টনে কীটনাশক আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জমবে, জমিতে প্রযুক্ত হবে, যত্রতত্র পড়ে থাকবে, খোলা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বে এটি মোটেই টেকসই উন্নয়নের অনুকূল নয়, মানুষের এবং তার সহায়ক জীব ব্যবস্থার স্বাস্থ্যের জন্যও এটি হুমকিস্বরূপ। এসব কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য পরিবেশে অনেকদিন টিকে থেকে, খাদ্য-শৃঙ্খলের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের দেহে চলে আসছে—আমাদের মাছ, পশুপাখি তাদের দেহে তো বটেই। এগুলো দেহকোষে একটু একটু করে জমে শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের জন্য বড় আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুরনো অব্যবহারযোগ্য কীটনাশক, কীটনাশকের আধার যা নানা কাজে পরে ব্যবহার হয়—এসবও পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য কম হুমকি নয়।

আজ তাই রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া থেকে সরে এসে একটি সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থার দিকে আমাদের যেতে হবে—যাতে সম্ভাব্য সব রকমের উপায়ের একটি পরিবেশ—অনুকূল সমন্বয় ঘটানো হবে। এসব উপায়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফাঁদ কিংবা অন্যরকম সরাসরি হস্তক্ষেপ বা কীটপতঙ্গ বেছে ফেলা থেকে শুরু করে আধুনিক জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগ পর্যন্ত সবকিছু থাকবে। প্রাকৃতিক কীট দমনকারী কীট যেন সহঅবস্থান করতে পারে সে রকম পরিবেশ সৃষ্টিও এর আওতায় পড়ে। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহৃত হবে শুধু যেটুকু না করলেই নয় সেটুকু।

# যা হিসাবে আসে না

শক্তির উৎস কি পরিমাণ ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি একটি সমাজের ধন সমৃদ্ধি এবং জীবন-যাত্রার মানের পরিচায়ক। এই বিচারে বিশ্বের মধ্যে আমরা কোন জায়গায় আছি সেটি নিজেদের পরিস্থিতি যাচাইয়ের একটি যথার্থ পরিমাপ। দুনিয়ার সব মানুষের গড় যদি আমরা নিই তাহলে প্রত্যেকের মাথাপিছু জ্বালানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০০০ কিলোগ্রাম কয়লার সমতুল্য। কয়লাই জ্বালানো হচ্ছে এমন কথা নয়—প্রত্যেক শক্তি যা ব্যয় করছে তা উৎপাদন করতে ঐ পরিমাণ কয়লার প্রয়োজন হত—এ কথাই বলা হচ্ছে। অবশ্য এ জ্বালানির মধ্যে শুধু সেই সবগুলোর ব্যয়ই ধরা হয়েছে যেগুলো ব্যবসায়িক জ্বালানি—জমা খরচের হিসাবের মধ্যে আসে। এর মধ্যে পড়ে কয়লা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।

পুরো দুনিয়া না বলে শুধু ইউরোপের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে মাথাপিছু জ্বালানি ব্যয় দাঁড়ায় ৩০০০ কিলোগ্রাম কয়লার সমতুল্য। এমন কি এশিয়ার ক্ষেত্রেও এটি হাজারের কোঠায়। আর আমাদের দেশে এই পরিমাপটি হলো মাত্র ৮০ কিলোগ্রাম কয়লার সমতুল্য। সারা বছরে গড়পড়তা এইটুকু জ্বালানিই আমরা ব্যয় করি। এই তুলনামূলক বিচারে বোঝা যায় সমৃদ্ধি আর জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে আমাদের অবস্থান কোথায়।

পরিবেশের আলোচনায় জ্বালানির এই হিসাবটি আসছে, তার কারণ পরিবেশের প্রশ্নটি জ্বালানির সঙ্গে খুব বেশি মাত্রায় জড়িত। অবশ্য আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বেঁচে আছে যে শক্তির উপর নির্ভর করে তার খুব কমই ব্যবসায়িক জ্বালানি। বলা যায় প্রকৃতির দান তারা গ্রহণ করছে যা ঐ হিসাবের মধ্যে যাচ্ছে না। এর কারণ জ্বালানির শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশি এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে রান্নার চুলা জ্বালাতে। আর বেশ কিছু শক্তি লাগছে শস্য ইত্যাদি নানা জিনিস শুকাতে। দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী জ্বালানি যোগাড় করে আশপাশ থেকে—ডাল পাতা যা কিছু পায় তাই। শুকানোর কাজ চলছে সৌর কিরণের অবারিত আশীর্বাদে। ঐ যে হিসাবে দেখা যাচ্ছে—৮০ কিলোগ্রাম কয়লা সমতুল্যের বেশি জ্বালানি ব্যয় করা হচ্ছে না, তাতে মনে হতে পারে যে জ্বালানির দহনের ফলে পরিবেশের উপর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশে হতে পারে না।

কিন্তু সমস্যা হলো যে বৃক্ষ সম্পদের উপর নির্ভর করে জ্বালানি আসছে, সেটি খরচ হচ্ছে বটে তবে তার জায়গায় নতুন বৃক্ষ জন্মাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনিতে গাছপালা নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্তর্ভুক্ত, যদি সেই নবায়নের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের জন্য জ্বালানি জনিত পরিবেশের ক্ষতিটি আসছে প্রধানত এ দিক থেকেই। রান্নার জন্য উদ্ভিজ্জ জ্বালানি ব্যবহার করা এমনিতে দোষের কিছু নয়। বরং অন্য জ্বালানির তুলনায় এর অনেকগুলো ভাল দিক রয়েছে। এটি স্থানীয়ভাবে ব্যবহারীর কাছাকাছি, এমনি তার দ্বারাই উৎপাদিত হতে পারে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না, দূর থেকেও আনতে হয় না। এর দহনে ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম—কয়লা তেলের তুলনায় তো বটেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো এটি নবায়নযোগ্য।

এ গুণাগুণের সুযোগ আমাদেরকে নিতে হলে বনজ সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে সঠিক অনুপাত বজায় রাখতে হবে। উৎপাদন বাড়িয়ে এবং ব্যবহারের দক্ষতা বাড়িয়েই শুধু এটি করা সম্ভব। জ্বালানির প্রয়োজনে যে উদ্ভিদ সম্পদ তাকে সযত্ন চাষ এবং সযত্ন ব্যবহারের আওতায় আনতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত চুলার মত জিনিস যখন ব্যবহারকারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জ্বালানি সাশ্রয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েও তিনি তা ব্যবহার করছেন না। এর একটি কারণ হলো সাশ্রয় করতে পারাটা যাদের খুব দরকার তাঁরা জ্বালানিটি ঠিক অর্থনৈতিক পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেন না। অন্যদিকে যারা তা করেন তাঁরা ব্যয়ের এই খাতকে তেমন আমল দেন না, অথবা উদ্ভিদ জ্বালানির বদলে তেল, গ্যাস এ সবের উপরেই নির্ভর করেন। উদ্ভিজ্জ জ্বালানির আয়-ব্যয় নিয়ে তোয়াক্কা না করা এবং এর ব্যবহার দক্ষতার প্রতি মনোযোগী না হওয়ার বিষয়টি ক্রমেই আমাদের পরিবেশের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব রাখছে। এতে আমাদের বন সম্পদের নবায়নযোগ্যতা আর থাকছে না—একেও ব্যবহার করা হচ্ছে তেল কয়লার মত চিরতরে একবারের জন্য। ঘন উদ্ভিদরাজির জন্য গর্বিত আমাদের দেশেরও কোন কোন অঞ্চলে এটি মরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সাধারণভাবেও বৃক্ষ সম্পদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। অন্যদিকে অদক্ষ চুলা এবং অন্য বিভিন্ন অদক্ষ ব্যবহার উদ্ভিজ্জ জ্বালানির সম্পূর্ণ দহনে বাধা দিয়ে বাতাসে যেতে দিচ্ছে ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া। মাথাপিছু মাত্র ৮০ কিলোগ্রাম কয়লা সমতুল্য বাণিজ্যিক জ্বালানি পুড়েও আমরা তাই এই দিক থেকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি না।

# তেল-কয়লার কালিমা

মাথাপিছু হিসাবে বাণিজ্যিক জ্বালানি আমাদের দেশে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়। এটি আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম একটি প্রকাশ। কিন্তু যেটুকু জ্বালানি ব্যবহার তার সৃষ্ট দূষণও শংকিত হবার মত—বিশেষ করে শহরে ও শহরতলীতে। জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে, বর্তমান দারিদ্র থেকে উত্তরণ পেতে হলে আমাদেরকে অনেকদূর যেতে হবে, জ্বালানির ব্যবহার অনেকখানি বাড়াতে হবে। পরিবেশ দূষণের বর্তমান অবস্থা বজায় রেখে সেটি করতে গেলে বিপদ ঘটবে। তাই দেখা যাক বর্তমান ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানিগুলোর দিক থেকে পরিবেশের উপর আঘাত কিভাবে আসে।

আমাদের বাণিজ্যিক জ্বালানির সামান্য খানিকটুকু বাদ দিলে বাকি সবই ফসিল জ্বালানি—গ্যাস, তেল, কয়লা। দুনিয়ার সব দেশেই আজ ব্যাপারটি তাই। এর মধ্যে গ্যাস আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই একটি জ্বালানি উৎস আমাদের খানিকটা আছে—বাকি সবই আমদানিকৃত। সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠীর জ্বালানির মধ্যে তাই প্রাকৃতিক গ্যাস হলো সবচেয়ে হালকা অণুর। এতে মিথেনের সঙ্গে অল্প পরিমাণে থাকে অন্য কয়েকটি গ্যাস প্রধানত নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হিলিয়াম। এর মধ্যে কিছু জিনিস আছে যা পরিবেশ দূষণকারী—যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড যা সালফার দূষণের সৃষ্টি করতে পারে এবং ক্ষয়কারী হতে পারে। তবে গ্যাসে এটি যে পরিমাণে থাকে তাতে দূষণ অপেক্ষাকৃত কম। আসলে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বলা যায় ফসিল জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে কম দূষণকারী। উন্নত পরিবেশন সচেতন দেশগুলো এখন চাচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসকেই বেশি ব্যবহার করতে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এই প্রাকৃতিক গ্যাসকে নিজেদের সম্পদ হিসাবে পেয়েছি এবং ব্যবহার করতে পারছি। গ্যাসের অপচয় রোধ করার পেছনে এও একটি তাগিদ হওয়া উচিত। ফসিল জ্বালানির মধ্যে এটিই আমাদের আছে, আর পরিবেশের দিক থেকে এটিই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

তেলকে বলা যায় আধুনিক সভ্যতার চালিকাশক্তি। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি ব্যবহৃত জ্বালানি হলো তেল। কাজেই যাবতীয় কর্মকাণ্ড, জীবনযাত্রার মান সেখানে তেলের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হবে তা আর বিচিত্র কি।

আমাদের অবস্থা অতখানি না হলেও আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড তেলের অভাবে অচল হয়ে যায়—যানবাহন, সেচ পাম্প ইত্যাদির উপর এর প্রভাব তাৎক্ষণিক। পরিবেশ দূষণকারী হিসাবে তেলের স্থান কিন্তু তালিকায় খুব উঁচুতে।

তেলের পরিবেশ দূষণ ক্রিয়া শুরু হয় খনি থেকে এর স্থানান্তর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই। বিশাল সব ট্যাংকারগুলো দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তেল পরিবহনের কাজে রত আছে। এসব ট্যাংকার থেকে এ তেলের অতি সামান্য অংশও যদি বের হয়ে সমুদ্রের পানিতে যায় তবে শুরু হয় এক ভয়াবহ কাণ্ডের। সমুদ্রে, বিশেষ করে উপকূলের কাছে এটি হরদম ঘটছে।

তেলে জলে মেশে না এটি তো প্রবাদ বাক্য। পানিতে গিয়ে তেল উপরে ভাসতে থাকে। স্রোতের সঙ্গে নানা দিকে গড়ায়—পানি ঢেকে যায় পাতলা তেলের আস্তরণে। জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ যাই এর সংস্পর্শে আসে তাই ঢাকা পড়ে এমনি তেলের আস্তরণে। স্রোত আবার এই তেলকে নিয়ে আসে উপকূলে। সমুদ্রতীর ঢাকা পড়ে এতে। প্রাণী ও পরিবেশের উপর এ সবের প্রভাব বড় আকারে আগে অনেকবার দেখা গেছে। এবার উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এর একটি ভয়াবহ রূপ আমরা দেখলাম।

তেলের আসল পরিবেশ দূষণকারী ভূমিকা শুরু হয় এর দহনের সময়। এতে যে পরিমাণ বিষময় গ্যাস বাতাসে যায় সেটি আশংকাজনক। কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড তো আছেই তার উপর রয়েছে সীসা। গাড়ি এবং শিল্প কারখানা নগরের বাতাসকে যে অত্যন্ত দূষিত করে ফেলেছে তার প্রধান উৎস এই তেলের দহনের মধ্যে। এ কথা আজ তারাও বুঝছে তাদের জীবনযাত্রা তেলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই তেলের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত কম দূষণ সৃষ্টির জন্য আরো পরিশোধন, উন্নত ইঞ্জিন ইত্যাদি উদ্ভাবন হচ্ছে সেখানে। কিন্তু এ সব অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। এসব সত্ত্বেও শিল্পোন্নত দেশগুলো ভবিষ্যতে তেলের ব্যবহার কমিয়ে আনার চিন্তা ভাবনা করছে। উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে, অথচ ব্যয়বহুলতার কারণে তেলকে নির্দোষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সম্ভাব্য অন্য জ্বালানির দিকে তাকানো ছাড়া আমাদের কি উপায় আছে?

কয়লা এখনো দুনিয়ার অন্যতম প্রধান ফসিল জ্বালানি। তুলনামূলকভাবে দুনিয়ায় এর প্রাপ্যতাও বেশি, যথেষ্ট মজুদ এর এখনো রয়ে গেছে। আমাদের দেশেও মজুদ আছে। যদিও সে কয়লা আহরণ সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো-বা সামনে আমাদেরকে এর উপর বেশ কিছু নির্ভর করতে হবে। সেক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে এর ব্যবহারে। এটি নগর অঞ্চলে না হয়ে যেন অপেক্ষাকৃত হালকা বসতির জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ কয়লার ধোঁয়া এবং এর থেকে অন্যান্য গ্যাসের উদ্গীরণে বায়ু দূষণের অনেক উপাদান থাকে।

এ সব ফসিল জ্বালানি হয়তো আমাদেরকে আরো বেশ কিছুদিন ব্যবহার করতে হবে, ক্রমবর্ধমান হারেই করতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত এদের উপর অতি নির্ভরশীলতা আমাদের কমাতে হবে এবং তাতে খুব বেশি দেরি করা চলবে না। একে তো এদের প্রাপ্যতা আর বেশি দিন থাকবে না, আমাদের দেশে তো নয়ই। অন্যদিকে এর দূষণকে অসহনীয় পর্যায়ে চলে যেতে দিলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হবার আশংকাই বেশি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকেই আমাকে ঝুঁকতে হবে—যে জ্বালানির উপর আমরা ভরসা রাখতে পারি—প্রাপ্যতার দিক থেকে এবং পরিবেশের দিক থেকে।

# দক্ষ জ্বালানি, মুক্ত বায়ু

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। এ প্রবাদ সত্য প্রমাণ করেছে শিল্পোন্নত বিশ্ব পরিবেশের ক্ষেত্রে। ফসিল জ্বালানির হাজারো দোষ। শিল্প বিপ্লবের আমল থেকে এ জ্বালানি ব্যবহার করে নিজেরা বিশ্বের ভুক্তভোগীদেশ হয়েছে, পুরা বিশ্বকেও ক্রমবর্ধমান হারে পরিবেশ অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু দেরিতে হলেও সেখানে সচেতনতা এসেছে এবং যখন এসেছে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে এর যথাসম্ভব প্রতিকারে। অন্তত ফসিল জ্বালানিকে দোষমুক্ত করার ব্যাপারে সেখানে যতখানি সাফল্য এসেছে মাত্র দুদশকে- সেটি অবাক হবার মত।

সাফল্য আনার জন্য যেসব ব্যবস্থা নিতে হয়েছে সেগুলো বহুমুখী। সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা ছিল, নীতি ছিল, লক্ষ্যমাত্রা ছিল তাই এসব সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পেট্রোল সীসা থাকার কথাটা ধরা যাক। এই সীসার পরিমাণ কমানোর জন্য কানাডা যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মধ্যে প্রধান ছিল সীসাযুক্ত পেট্রোলকে বেআইনী ঘোষণা করা। জাপান নির্ভর করেছে ট্যাক্সের তারতম্য সৃষ্টির উপর। একই নীতি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর দেশগুলোও গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এ সমস্যার সমাধানের জন্য অভিনব একটি বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তেল শোধনাগারগুলোকে একটি সময়সীমার মধ্যে সীসা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যেসব শোধনাগার সময়সীমার আগে এটি করতে পারে তারা অন্য শোধনাগার যারা এটি করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের কোটার সরবরাহ অর্ডার লাভ করে।

সত্তরের দশকের পর থেকে উন্নত দেশগুলোতে পাওয়ার স্টেশন এবং কারখানা-গুলো চিমনী থেকে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড কমাবার জন্য বড়সড় উদ্যোগ নেয়া শুরু হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে জাপানে প্রতি কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৭ গ্রাম থেকে ১ গ্রামেরও কমে আনা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বায়ু আইন পাস করা হয়। এতে বাতাসের বিশুদ্ধতার কাম্য মান অর্জনের জন্য একটি সময়সীমা বেধে দেয়া হয়। তাই কয়লার ব্যবহার বাড়া সত্ত্বেও সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমে গেছে অনেকখানি।

জার্মানি প্রথম দিকে এতখানি সজাগ হয়নি, সত্তরের দশকে তার নীতি নির্ধারকরা কিছুটা অবহেলা করেছে। অশির দশকের শুরুতে জার্মানিরা আবিষ্কার করলো যে তাদের মূল্যবান বন সম্পদ লোপ পাচ্ছে। আর এর একটি বড় কারণ সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড। তখন এগুলো কমাবার জন্য আইন-কানুন এত কড়া করা হল যে তৎক্ষণাৎ সর্বাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলো। এখন আন্তর্জাতিকভাবে আঞ্চলিক ব্যবস্থা গ্রহণের উপরও জোর দেয়া হচ্ছে। যেমন ১৯৮০ সালে ইউরোপের ২১ জাতি সমঝোতা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের মধ্যে এসব ক্ষতিকর উদ্‌গীরণ শতকরা ০.৮০ মানের মাত্রা থেকে শতকরা ত্রিশ ভাগ কমিয়ে ফেলবে।

একই সমস্যাকে অন্য যেভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে তা হলো জ্বালানির দক্ষতা বাড়িয়ে। প্রযুক্তির বিকাশে এখন এই বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে—কত কম জ্বালানি খরচ করে এই একই কাজ করা যায়। কম জ্বালানি মানে, কম দূষণ, পরিবেশ অবক্ষয় থেকে মুক্তি। এখানেও নীতি স্পষ্ট। তবে ফসিল জ্বালানির দূষণ সৃষ্টির প্রবণতা কমাবার জন্য যে ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়েছে এক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ এখানে প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রসার অনেকটা চাহিদার উপর নির্ভারশীল। আর ভোক্তার চাহিদা জ্বালানি মূল্যের উঠানামার সঙ্গে পরিবর্তনশীল। সত্তরের দশকে তেলের দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ধুম পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে তেলের দাম পড়ে গেলে এই উদ্যোগে ভাটা পড়েছে। ১৯৮২ সালে জাপানী গাড়ি গড়পড়তা এক গ্যালন তেলে ৩০.৫ মাইল যেত। আর ১৯৮৭ সালে সেগুলো এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন গড়পড়তা গ্যালনে ২৭.৩ মাইলের বেশি না যায়। যেমন চাহিদা, তেমন সরবরাহ।

আস্থার যে অভাব আছে তাও ঠিক নয়। এটি অনেকটা দূরদৃষ্টি নিয়ে চিন্তার অভাব অথবা একের দেখাদেখি অন্যের অনীহা উপলব্ধি। অর্থনীতির নিয়ন্তারা এখনো জ্বালানি দক্ষ প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগকে দেখছেন সেই লোকের মত যার বন্ধু রাস্তায় পড়ে থাকা একশ টাকা নোটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন আরে ধ্যাৎ, সেই হতেই পারে না, রাস্তায় নোট পড়ে থাকলে এতক্ষণে তা অন্য লোকে ঠিকই নিয়ে যেত। ভাবখানা এই যে সত্যিই যদি লাভজনক হত তাহলে তো ওরকম প্রযুক্তি বেশি বেশি করে উদ্ভাবিত হত। তা হলে হচ্ছে না কেন। না হওয়ার বড় কারণ পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি একেবারে সহজ বাজার অর্থনীতির নিয়মে চলে না। এখানে লাভ ক্ষতিটি এত স্পষ্ট নয় যে মানুষ সব সময় নগদ অর্থ ব্যয়কে ভবিষ্যতের অর্থ ব্যয়ের চেয়ে বেশি ভয় করে। সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে না দেখার কারণে এত উন্নত দেশের ধনী উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে। দরিদ্র দেশে এমনটি হওয়া আরো স্বাভাবিক।

কাজেই পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য, এর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ সবার জন্য তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে আসে। পরিবেশের কথাটি মনে রেখে অর্থনৈতিক হিসাবকে নতুনভাবে কষতে হবে—যাতে এদিক থেকে যে অদৃশ্য ব্যয় সেটি যেন সবার কাছে স্পষ্ট হয়।

# ভবিষ্যতের জ্বালানি

ভবিষ্যতেও আমরা একই প্রচলিত জ্বালানিগুলোর উপরেই সর্বাংশে নির্ভর করে চলবো এমন কি কথা? আর এসব জ্বালানির এত যোগানই-বা আমাদেরকে কে দেবে? তেলতো সব বাইরে থেকেই আনতে হয়, কয়লাও নেই, আপাতত গ্যাস যা আছে উন্নয়নের আহ্বানে সত্যিকারভাবে সাড়া দিলে তাই বা ক'বছর যাবে? লাকড়ির উৎস তো ক্রমেই হারিয়ে ফেলেছি গাছপালা কেটে। তাহলে?

উপায় একটা আছে। তাহলো এসব প্রচলিত জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে এমন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো যেগুলোতে পরিবেশ দূষিত হয় না, অথচ সেগুলো সহজে পাওয়া যায়। দূষণহীন জ্বালানি কি হতে পারে? বিদ্যুতের কথাই ধরা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক তাপ দিয়ে যদি চুল্লি জ্বলে, বয়লার গরম হয়, বৈদ্যুতিক মটর যদি কল ঘোরায়, তাহলে পরিবেশের দূষণ হয় না। বাসের বদলে যদি চলতে পারতো ট্রাম কিংবা ইলেকট্রিক স্ট্রিটকার ঐ দিকটাও সুরাহা হত। আর ছোট গাড়িওতো চলতে পারে। স্টোরেজ ব্যাটারীর বিদ্যুৎ দিয়ে নিঃশব্দে; ধোঁয়া না ছেড়ে। বড় হয় না, দ্রুত গতি হয় না বা একটানা বেশিক্ষণ চলতে পারে না, কিন্তু পরিবেশের দিক থেকে এ বড় চমৎকার। আসলে মোটরগাড়ি চালু হবার গোড়ার দিকে এমন বৈদ্যুতিক গাড়ি এসেছিল। কিন্তু ঐ মন ভরলো না বলেই মানুষ একে ছেড়ে মূর্তিমান দূষণ উৎস পেট্রোল-ডিজেলের গাড়ি নিয়ে এমন মেতে উঠল। এখন দায়ে পড়ে বৈদ্যুতিক গাড়ির উন্নয়ন সাধন করে একেই আবার ফিরিয়ে আনার কাজে মন দিয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই দূষণ সমস্যার পুরো সমাধান হলো না, দূষণের উৎসটি শহর থেকে সরিয়ে দেয়া হলো মাত্র। যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সেখানে দূষণের ব্যাপাটি রয়ে গেল তেল গ্যাস কয়লার দহনে। জল-বিদ্যুতের উৎসতো দেশে আর তেমন বাকি নেই, থাকলেও অন্য ধরনের পরিবেশ বিশিষ্ট এড়িয়ে তা ব্যবহারের উপায় নেই, কাজেই দূষণ যায় না; তবে শহরের ঘনবসতিতে এটি যত মারাত্মক হয়ে উঠতে পারতো এর অলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় দূষণ ছড়িয়ে তার অনেকটা লাঘব হতে পারে এতে।

সব চাইতে ভাল হয় প্রচলিত জ্বালানির দহনের শুধু স্থানান্তরে নয় জ্বালানিটাই যদি দূষণমুক্ত হত। সে রকম দূষণমুক্ত জ্বালানি আমাদের রয়েছে, সারা দেশ জুড়ে প্রচুর পরিমাণে সেটি আমরা পেতে পারি। এ হলো সৌরশক্তি। না, এ কোন কষ্ট কল্পনা নয়, সৌরশক্তির দক্ষ ব্যবহার করে এ মুহূর্তেই বহু কাজ দুনিয়ার বহু জায়গায় হচ্ছে।

সৌরতাপ কেন্দ্রীভূত করে বাষ্প সৃষ্টির মাধ্যমে ২০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত শক্তির বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্র এখন চালু রয়েছে। এমন বিদ্যুৎ তৈরি করতে বায়ু দূষণের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও কল-কারখানায় প্রয়োজনীয় উত্তাপের একটি বড় অংশ সৌরতাপ থেকে আসতে পারে। এ জন্য দক্ষ প্রক্রিয়ায় সৌরতাপ সংগ্রহের কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলো ছোট বড় নানা আকারে পাওয়া সম্ভব—এমন কি বাড়িতে গেরস্থালী কাজের পানি গরম করতে। রান্নাবান্নার কাজটি এমন জিনিস যা প্রতি পরিবারে প্রতিদিন চলছে, চলছে নগরীর অসংখ্য হোটেলে রেস্টুরেন্টে। যদি মেলে দেয়া যায় সৌরচুলা, অন্তত যেখানে মেলে দেয়ার জায়গা রয়েছে সেখানে তাহলেও দূষণের পরিমাণ অনেক কমত।

অবশ্য নগরীতে সৌরশক্তির সবচেয়ে অকর্ষণীয় ব্যবহার হবে সৌর মোটর-গাড়িতে। এখানে সৌরশক্তি ব্যবহার হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। সূর্যের আলোকে সৌর কোষের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুতের রূপান্তরিত করা হয় এতে। গাড়ির গায়ে, ছাদে মেলে দেয়া থাকে বেশ কিছু সৌরকোষ। এর বিদ্যুতেই গাড়ির মোটর ঘুরে। বাড়তি বিদ্যুৎ জমা থাকে স্টোরেজ ব্যাটারিতে রাতের জন্য অথবা মেঘলা সময়ের জন্য। রাস্তাঘাটে এখনো তেমন দেখা না গেলেও এ গাড়ি বেশ কিছু তৈরি হয়েছে, এদের উপর কাজ হচ্ছে প্রচুর। অস্ট্রেলিয়ায় নিয়মিত একটি দৌড় প্রতিযোগিতা হয় সৌর মোটরগাড়িতে। পশ্চিমে পার্থ থেকে পূর্বে সিডনী পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথের দৌড়ে দিব্যি গাড়িগুলো চলে যায় জ্বালানি বাবদ একটুও খরচ না করে। গত বছর জাপানের কোবেতে এক সম্মেলন উপলক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে এ রকম প্রায় শ'খানেক গাড়ি।

ভবিষ্যতে কোন দিন ঢাকার রাস্তায় এদের প্রচুর পরিমাণে চলতে দেখলে সেটি হবে খুব খুশির দিন। রোজ রোজ আমদানি করা প্রচুর তেল পুড়তে হবে না বলেই শুধু নয়, আকাশ কালো করা প্রচুর ধোঁয়া উদগীরণ করার দরকার হবে না সেজন্যও বটে। সারা দুনিয়া ক্রমেই বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে দূষণহীন জ্বালানির দাবিতে। কাজেই গবেষণা চলছে, উৎসাহিত হচ্ছে সৌরশক্তির মত বিকল্পগুলো। সুস্থ পরিবেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের তীব্র হয়ে উঠেছে। আমাদের নগরীর জন্যও এমনি পরিবেশের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ আমাদের কাম্য। এ জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে সেই লক্ষ্যে, তৈরি থাকতে হবে পরিবর্তনগুলোকে স্বাগত জানাবার জন্য।

# শক্তির আরো কিছু উৎস

একটি কথা এখন সবার কাছে পরিষ্কার। পৃথিবীর অবশিষ্ট তেল নিয়ে যদিও মারামারির অন্ত নেই, ঐ তেলের মধ্যে আর আমাদের সত্যিকার ভবিষ্যৎ নেই। ফুরিয়ে যাবে সেটিই শুধু আশঙ্কা নয়। আশঙ্কার আরো কারণ হলো যে কয়দিন আছে সে কয়দিনে আমাদের পরিবেশের বিনষ্টকে ষোল কলায় রূপ দিয়ে যাবে এই সম্ভাবনা। গত মাত্র দু'শ বছরের ব্যবহারে এরা পরিবেশের হাল যা করেছে সে নিয়েই চিন্তার অন্ত নেই।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ, মানবজীবনের তথা পুরো জীবজগতের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের উপর। আদিতে নবায়নযোগ্য শক্তিই শুধু ছিল বলে মানুষ আজো টিকে আছে। ভবিষ্যতেও আবার আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য এর উপরেই নির্ভর করতে হবে। যথাসম্ভব এখন আমরা তা করবো, যদি পরিবেশকে রক্ষা করতে চাই।

নবায়নযোগ্য শক্তির কথা বলতে গেলে সবার আগে মনে পড়ে সূর্যের কথা, যার শক্তি চিরকাল আমরা অনুভব করেছি, ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখন শিল্প, কৃষি, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শক্তির আধুনিক উৎস রূপে পেতে হলে এর ব্যবহার হতে হবে আরো অন্যভাবে, অনেক বেশি দক্ষভাবে। সেটি করার সুযোগ এনে দিচ্ছে গবেষণা উন্নয়ন। কিন্তু যারা এ কাজে বিরাট আকারে বিনিয়োগ করতে পারত তারা নিজেদের অর্থনীতির জন্য এর প্রয়োজন অনুভব করছে না। তাই বিনিয়োগ হয়েছে সীমিত, অগ্রগতিও তাই। ঐ সীমিত অগ্রগতির মধ্যেও আমরা যা পেয়েছি তা এখনই আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম, বিশেষ করে আমাদের পরিবেশকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবার প্রক্রিয়াকে রোধ করে।

সেই শক্তির দক্ষ ব্যবহারের জন্য নানা পদ্ধতি উদ্ভাসিত হয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশাল আয়না—সব কটি সূর্য রশ্মিকে প্রতিফলিত করে কেন্দ্রীভূত করছে একটি বয়লারের উপর। এর তাপে বাষ্প হয়, তার শক্তিতে তৈরি হয় বিদ্যুৎ। এ একটি পদ্ধতি। অনেকগুলো সৌরকোষে সূর্যকিরণে মেলে দিয়ে সরাসরিও তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। এর অনেক সুবিধা, ঘরে ঘরে তৈরি হতে পারে এর নিজের বিদ্যুৎ। মাঠে কৃষক নিজের সৌরকোষ দিয়ে নিজের পাম্প চালাতে পারে, তাহলে শক্তির একটি নিত্য উৎসের

ব্যবহার আমাদের জন্য সহজ হয়। উৎসটি যে অফুরন্ত শুধু তাই নয়, এই জ্বালানি বাতাসকে দূষিত করে না কোনভাবেই।

বাতাসের শক্তিও এখন নতুন করে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। চরকির মত আধুনিক বায়ুকলগুলো সংলগ্ন জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে পৃথিবীর দেশে দেশে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতেই শুধু বায়ুকলগুলো বছরে সাড়ে তিন লক্ষ ব্যারেল তেলের সমপরিমাণ জ্বালানির সাশ্রয় করছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়নি, ব্যবহারও অতি সীমিত। কারণ যারা তা ব্যবহার করছে এবং করেছে তারা তাগিদ অনুভব করছে না, তারা এখনও তেলের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখলেই নিজেদের চলে যাবে মনে করছে, মুখে না বললেও কার্যক্ষেত্রে তাই প্রমাণ হচ্ছে। আর আমাদের মত যাদের সুযোগ নেই, তারাও নিজের থেকে কিছু করার কথা ভাবছে না। তেল না থাকলেও সূর্য কিরণ বা বায়ুস্রোত যে আমাদের আছে এবং তা যে তেলের ভাল বিকল্প হতে পারে এই ব্যাপারে আমরা যা পারি তাও করছি না।

সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক জায়গার জলরাশিতে জোয়ার-ভাটার টান রয়েছে। এই টানকেও ব্যবহার করা যায় নিত্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস হিসাবে। সূর্য বা বাতাসের ব্যবহারের মত এর ব্যবহারও মানুষ যে আগে জানত না তা নয়। বহু দিন আগে লন্ডন শহরের মাঝে আলগেইটের এক মঠে যাজকরা টেমসের মধ্যে আসা জোয়ার ব্যবহার করে তাঁদের গম ভাঙতেন এমন কথা লিপিবদ্ধ আছে। কাজটি কঠিন নয়। নদী সংলগ্ন তাঁদের পুকুরটিতে জোয়ারের পানি এলে তা ফুলে উঠতো। পানি ফোলা থাকা অবস্থাতেই পানি ঢুকার ফটকটি বন্ধ করে দেয়া হত। এরপর ভাটায় বাইরে পানি নেমে গেলে ফটকটি খুলে দেয়া হত যাতে পানি নিচের দিকে পড়ার শক্তিতে জল-চাকা ঘুরিয়ে গম ভাঙ্গার চাকি চালানো যেত। আজকালকার আধুনিক ব্যবস্থাগুলোর নীতিও ঐ একই। তবে প্রয়োজনটি বিশাল এবং উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। ফ্রান্সের উত্তরে রান্সে এই পদ্ধতিতে প্রায় আড়াই লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। সেখানে নদী মোহনায় বাঁধ দিয়ে কাজটি করা হচ্ছে। একটি বড় সমস্যা হলো জোয়ার-ভাটা বছরের নানা সময়ে নানা রকম হয় বলে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ সব সময় এক থাকে না। কিন্তু ব্যবহারটি চমৎকার। প্রকৃতির শক্তিকে সুকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছে অথচ পরিবেশের দিক থেকে তেমন কোন দাম দিতে হচ্ছে না এর জন্য।

নরওয়েকে নিতে হয়েছে অন্য একটি ব্যবস্থা যা সমুদ্রের শক্তিকে ব্যবহার করছে, ঠিক জোয়ার-ভাটার নয়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ওঠা-নামার শক্তিকে। তরঙ্গ ওঠা নামা এখানে একটি চোঙ্গের মধ্যে বাতাসকে সঙ্কুচিত করে টার্বাইন ঘোরায়। এ ধরনের ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই সমুদ্রে নেয়া সম্ভব। তেমনি নদী মোহনার কাছে অনেক জায়গাতেই বাঁধ দেয়া যায় জোয়ার-ভাটার শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য।

এর সবই প্রকৃতির কাছ থেকে অফুরন্ত শক্তি আহরণ করার কৌশল। আগামীতে আমাদেরকে এমনি সব কৌশলের উপর নির্ভর করতে হবে। এমনি আর একটি বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদেরকে অনাদিকাল থেকে শক্তি যুগিয়েছে অফুরন্তভাবে, আজও যোগাচ্ছে। কিন্তু আমরা তার আরো দক্ষ ব্যবহার দূরে থাক ঐ অফুরন্ত জিনিসকে

চিরতরে নষ্ট করার ব্যবস্থা করছি। এটি আমাদের বনসম্পদ। অতীতে যারা ব্যাপকভাবে বনের কাঠকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছে, তারাও বনের একটি অংশের গাছ কেটেছে তারপর বেশ কিছু বছর সময় দিয়েছে সে গাছ গোড়ার থেকে আবার গাছ জন্মানোর জন্য। ফলে বন কখনো কমত না, বনের গোড়ায় মাটিতে ধুয়ে যেত না, থাকত জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ হয়ে।

কিন্তু আজ সেই নীতি পালটে গেছে। আজ এই মুহূর্তে প্রতি মিনিটে ৩০ হেক্টরের বেশি বনভূমির গাছ সাফ করে কেটে ফেলা হচ্ছে। এর মধ্যে বড় জোর ২ থেকে ৫ বছরের মধ্যে পুনরায় গাছ লাগানো হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ১৪০০ হেক্টর বনভূমি উজাড় হচ্ছে প্রতিদিন। অথচ আধুনিক হিসাবে দেখা যায় এক লাখ হেক্টর বনভূমি রক্ষিত হলে এবং নিয়মিত তার থেকে গাছ কাটা হলে তাতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবার মত জ্বালানি নিয়মিত পাওয়া যায়, অন্যান্য বনজ সম্পদের কথা বাদ দিলেও।

পরিবেশের দিক থেকে নবায়নযোগ্য এই শক্তি উৎসটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই বন শুধু জ্বালানি যোগাবে না। এটি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। কিন্তু এই চিন্তা বাদ পড়ছে তাৎক্ষণিক স্বার্থ উদ্ধারের তাগিদে। আজ পরিবেশের কথার আলোচনায় জ্বালানি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও উদ্যোগ পাল্টানোর প্রয়োজনটি তাই সর্বাগ্রে বিবেচনার যোগ্য।

# জ্বালানির বিষয়ে সহজ বুদ্ধি

পরিবেশের সঙ্গে জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর জ্বালানির সমস্যাটি সারা দুনিয়াকে আজ ভবিষ্যতের ভাবনায় ভাবিয়ে তুলেছে—আমাদেরকে তো বটেই। শেষ পর্যন্ত জ্বালানি ও পরিবেশ নিয়ে বিশ্ব ভাবনার থেকেই আমাদের নিজেদের নীতি আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। তেলের দামের উঠানামা যেমন একটি সার্বজনীন ব্যাপার, তেমনি সৌরশক্তি দক্ষভাবে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যাওয়ার গবেষণা কিংবা পরমাণু শক্তি আদৌ কোনদিন আমাদের আয়ত্তে আসবে কিনা এসব সিদ্ধান্তের অনেকখানি বিশ্ব ভাবনারই অন্তর্গত। অথচ এর সঙ্গে যেমন জড়িত রয়েছে আমাদের উন্নয়নের অত্যন্ত জরুরী বিষয়টি তেমনি জড়িত রয়েছে আমাদের পরিবেশ রক্ষা ও সুস্থ জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তার বিষয়টিও।

উন্নত দেশগুলোতে জ্বালানি ও পরিবেশ নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের মধ্যে ছোট একটি দল আছে যাঁরা মনে করেন এ সমস্যাটি নেহাৎ সাময়িক। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বৃহদাকারে এসে এ সমস্যার সমাধান করবে। সমস্যাটি আসবে হয়তো বা পারমাণবিক ফিউশন প্রক্রিয়ায় মহাসমুদ্রের সব পানিকে জ্বালানিতে পরিণত করে। এমনটি যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে পরিবেশ কোন সমস্যা নয়। কেন্দ্রীয় জনন কেন্দ্র থেকে অফুরন্ত শক্তি উন্নত প্রক্রিয়ায় পরিবাহিত হয়ে সর্বত্র পৌঁছে যাবে, এ প্রক্রিয়ায় কোথাও পরিবেশের গায়ে আঁচড় লাগবে না।

অধিকাংশরা কিন্তু এমন শক্তিমান ও বৃহদাকৃতি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি দেখতে পান না। জ্বালানি ও পরিবেশের সমস্যাটির সমাধান তাঁরা দেখতে পান অন্যদিকে। তাঁরাও ভরসা করছেন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপরেই। তবে কেন্দ্রীয় বৃহদাকৃতি শক্তি জনন কেন্দ্রের উপর বৈজ্ঞানিক বিনিয়োগের চেয়ে তাঁরা একদিকে নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণায় এবং অন্যদিকে শক্তির সংরক্ষণে অধিক মনোযোগী হওয়ার মধ্যেই পরিত্রাণ দেখতে পাচ্ছেন।

জ্বালানির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে কতগুলো সহজ বুদ্ধির যুক্তি মেনে নেয়া যেতে পারে। জ্বালানি সৃষ্টিতে এবং শক্তি উৎপাদনে যা ব্যয় তার একটি বড় অংশ যদি একে কার্যক্ষেত্রে নিয়ে ব্যবহার করতেই ব্যয় হয়ে যায় তাহলে কাজ হবে কম, খরচ

হবে বেশি এবং তদুপরি পরিবেশ দূষণও হবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি। এদিক থেকে উন্নত দেশগুলোও তাদের সর্বত্র শক্তি সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে সাহস পাচ্ছে না—আমাদের মত দেশের তো প্রশ্নই উঠে না। করাত দিয়ে আমরা পুডিং কাটি না, কিংবা রোদ দিয়ে ইস্পাত গলাবার চেষ্টা করি না। অথচ জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঠিক এই সকল কাজই আমরা অবলীলাক্রমে করে চলেছি। উন্নত দেশে যখন তেল পুড়ে বিদ্যুৎ খরচ করে ঘর গরম করা হয় তখন তেলের বা বিদ্যুতের একটি অপ্রয়োজনীয় অযথার্থ কাজই করা হয়। দেখা গেছে একটু যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বাড়ি তৈরি করলে ঘর গরমের কাজটি সূর্যকিরণ আটকিয়েই করা সম্ভব। যদিও এখন সবাই জানে এটি সম্ভব, তবুও অল্প ক'জনই শুধু তা প্রয়োগ করেছে বাকিরা ওকে চিন্তার মধ্যেই আনছেন না।

তেমনি ধরা যাক আমাদের রান্না-বান্নার ব্যাপারটি। এই গরীব দেশে, জ্বালানি উৎসের আক্রার দেশে আমরা আমাদের শতকরা সত্তর ভাগ জ্বালানি উৎস রান্না-বান্নার কাজে ব্যয় করছি। পরিবারের দুবেলা সাধারণ রান্নার জন্য চুলায় যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয় তার খুব কম অংশই রান্নায় লাগে, অধিকাংশই স্রেফ অপচয় হয়। আমাদের একমাত্র ফসির জ্বালানি বা বলতে গেলে একমাত্র খনিজ সম্পদ যে গ্যাসকে জ্বালানির উন্নত কাজসহ বহুবিধ যথাযথ প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব এবং উচিত তার একটি বড় অংশ আমরা লাগাচ্ছি নগর বাড়ির রান্নার প্রয়োজনে যে কাজে আসলে তার প্রয়োজন ছিল না। সংরক্ষণ, মাত্রায়, পরিবেশ রক্ষা কোনদিক থেকেই এসব অযথার্থ ব্যবহার অনুকূল নয়। অধিকাংশ রান্না পানির স্ফুটনাংকে অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সম্পন্ন হয়। এ উত্তাপের কিছু নিচে রেখেও অধিক সময় দিলে তাতেও রান্না হয়ে যায়। একবার ফুটিয়ে নিয়ে হট বক্সের মত তাপ নিরোধী বাক্স রেখে দিলে ওতেই রান্না হয়ে যেতে পারে। সৌরকিরণ আটকাতে পারলে তাতেও বাক্সের মধ্যেই রান্না হতে পারে। এ সব আমরা চিন্তা করলাম না, এখনো করছি না কারণ মনে করছি নষ্ট করবার লাকড়ি পোড়াবার গ্যাস সব আমাদের রয়েছে কাজেই অভ্যাস বদলাবার প্রয়োজন কি? তবুও যদি তা ভাবি অর্থনীতি বা পরিবেশ কোনটিই টিকবে না? গরম পানি বহু রকমের ব্যবহার আমাদের নিত্য করতে হয়—ধোয়া, মোছা, সিদ্ধ, কারখানার কাজ কত কি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেও পানি খুব বেশি গরম লাগে না—৬০-৬৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলেই চলে। এমন পানির জন্য লাকড়ি, কয়লা বা তেলের বয়লার লাগানো কি যুক্তি সঙ্গত? সৌর পানি উত্তাপক আজকাল অনায়াসেই দেশে তৈরি করা যায় যা দিয়ে সূর্য কিরণেই এ কাজ চলে। আসলে আমরা শক্তি উৎসের গুণ বিচার করি না তাই কামান দেগে মশা মারছি এবং আসল আয়োজনে সে কামান আর পাই না। শক্তি উৎসের কোন কোনটি উচ্চগুণ সম্পন্ন এতে ঘনত্ব বেশি। তেল গ্যাসকে আমরা এ দলে ফেলতে পারি। সীমিত এই উচ্চ গুণের জ্বালানিকে তার যথাযথ কাজের জন্য সংরক্ষণ করা চাই। অন্যদিকে সূর্য কিরণের মত জিনিস নিম্নগুণ সম্পন্ন কারণ তার শক্তি-ঘনত্ব কম। কিন্তু এর বিস্তৃতি সর্বত্র গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে। কাজেই যে ব্যবহারে অল্প ঘনত্বের শক্তি যথেষ্ট; যে ব্যবহার দেশের ঘরে ঘরে এমনকি সুদূরতম গ্রামেও যেখানে আমরা এরই শরণাপন্ন হবো না কেন?

# প্রশ্ন এখন উঠছে

মনে করুন এই মুহূর্তে আমরা সব রকমের জ্বালানি, শক্তির সব রকমের উৎসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। শক্তি আমরা উৎপাদন করবো না, সরবরাহ করবো না, সঞ্চয় করবো না, ব্যবহার করবো না। ভাবুনতো কি অবস্থাটা দাঁড়াবে এখন। রাস্তাঘাট একবারে শান্ত রিক্সার বেলের আওয়াজ নেই। কলকারখানার চাকা বন্ধ, সিমেন্ট, রড, কংক্রিট কিছুই নেই, অর্ধ সমাপ্ত দালান অর্ধ সমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। আর সবাই ঘরে ফিরে যা দেখছেন তাতে আরো থ হয়ে যাবেন—চুলা বন্ধ, খাবার নেই। সন্ধ্যার আগেই ঘুমাবার উদ্যোগ নিতে হবে কারণ বাতি জ্বলবে না বৈদ্যুতিক তো নেই, তেলের কুপী, মোমবাতি কোনটাই নেই। শক্তি উৎস ছাড়া জীবন একেবারেই অচল। যত দিন গিয়েছে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, জীবন-যাত্রায় উন্নয়ন এসেছে, আর উভয় কারণে জ্বালানি ব্যবহারে দ্রুত বৃদ্ধি আর পরিবর্তন এসেছে। আর একই সঙ্গে এটি দ্রুত প্রভাবান্বিত করেছে মানুষের পরিবেশকে। মাত্র দেড়শ বছর আগে সারা বিশ্বে যে জ্বালানি সমস্ত কাজ মিলিয়ে দৈনিক খরচ হত তেলের হিসাবে তাকে বলা যায় ৮০ ব্যারেল তেলের সমতুল্য। আর আজ ছোট একটি দেশ জাপান একাই দৈনিক এই পরিমাণ শক্তির কাছাকাছি ব্যয় করছে। তাহলে আমরা ভাবতে পারি দেড়শ বছরের তুলনায় আমাদের পরিবেশের অবস্থা কেমন হতে পারে? এটি এখন সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, শান্তির সময় মানুষের পরিবেশকে বিষময় করে তোলার জন্য এককভাবে সবচেয়ে দায়ী জিনিসটি হলো শক্তির উৎস এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি। বনভূমির, বৃক্ষাচ্ছাদনের বিনষ্টি, নগরাঞ্চলের বিষময় বাতাস, এসিড বৃষ্টি, জলবিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরিবেশের জন্য দরকারী বিস্তীর্ণ ভূমির জলমগ্নতা, দূষণ-কলুষিত নদী ও জলধারা, এর মধ্যে আবার সময় সময় চেরনোবিলের মত তাৎক্ষণিকভাবে মারাত্মক ঘটনা এ সবেরই মধ্য রয়েছে শক্তি উৎস। আরো ব্যাপক আরো সুদূর প্রসারী অবক্ষয়ের যে ভয়ংকরী ইশারা দেখা যাচ্ছে—সেই গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া এবং ফলে সৃষ্ট বিশ্ব উচ্চতা বৃদ্ধি ও সার্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, ওজোন স্তর বিনষ্টির ফলে সৃষ্ট নিরাপত্তাহীনতা এগুলোর কারণও একই। যেসব প্রশ্ন উঠেনি পঞ্চাশ বছর আগেও আজ তাই সেসব প্রশ্ন উঠছে। সামনের দিনগুলোতে নানা আশংকা, বিশ্বটি আদৌ টিকবে কিনা সে নিয়েও কথা হচ্ছে। ২০১০

সালের মধ্যে বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবে আরো ২০০ কোটি মানুষ। নানা রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে নিলেও সেই সময়ের মধ্যে শক্তির আয়োজন হবে এখনকার অন্তত দেড়গুণ।

আশার কথাও রয়েছে। শক্তি উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশ অবক্ষয় নিয়ে যে সচেতনতা সাম্প্রতিককালে সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলশ্রুতিতে আশার বাণী শোনাতে এগিয়ে এসেছে প্রযুক্তি। গত তিন দশক ধরে প্রযুক্তি সক্রিয় হয়েছে কলকারখানা থেকে, গাড়ি থেকে জ্বালানির কারণে দূষণ কমিয়ে আনতে। আমাদের দেশ এখনো তার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হলেও উন্নত বিশ্বের অনেক অঞ্চলে এর নগদ ফল যা পাওয়া যাচ্ছে সেটি সামান্য নয়। ওখানে গত মাত্র ১৫-২০ বছরের মধ্যে নগরীর বাতাসে বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৩০ থেকে ৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাতাসে ধূলিকণা ভস্মের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ৪০-৫০ শতাংশ। অতি মারাত্মক সীসার পরিমাণ বাতাসে কমে গেছে উত্তর আমেরিকার নগরগুলোতে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত, আর ইউরোপের নগরাঞ্চলের ৫০ শতাংশ। প্রযুক্তিকে পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে নিয়োগের কাজটি অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বলতে গেলে এখনো বিশ্ব এর প্রারম্ভেই রয়েছে। একে অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে বৈ-কি।

তবে সেই অগ্রগতিতে যথেষ্ট সমস্যাও রয়েছে। আমাদের মত দরিদ্র অর্থনীতির জন্য তো যে-কোন ব্যয়বহুল প্রযুক্তি সুদূর পরাহত তা পরিবেশের জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া এমনিতেও বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়ে গেছে। যথেষ্ট ব্যয় ও উদ্যোগ নেয়া হলে সালফার, সীসা ইত্যাদি কয়লা বা তেল থেকে বাদ দেয়া যায়। কিন্তু তাতে একই পরিমাণ শক্তি পাওয়ার মত দহনে বরং বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের ব্যবস্থা হয়। কয়লা থেকে কার্বন দূর করার কোন পদ্ধতি অচিন্তনীয়। অতএব ফসিল জ্বালানির দহনে কার্বন ডাই-অক্সাইডের হাত থেকে তথা গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার থেকে মুক্তি নেই। তেল কয়লার দহনে গ্যাস ব্যবহার কারণে এদিক থেকে কিছু সুবিধা হয়।

প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসিল জ্বালানিকে দোষমুক্ত করেও এগোবার পথে কয়েকটি বাস্তব বাধা রয়েছে। এর একটি হলো আগামীতে জ্বালানি ব্যবহার অধিকতর দ্রুত হারে বাড়তে বাধ্য অনুন্নত বিশ্বে যাদের কাছে জ্বালানি পরিষ্কার করার সামর্থ্য নেই। উন্নত বিশ্বে কয়লার ব্যবহার থেকে সরে গেলেও তৃতীয় বিশ্বে এর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই বাড়বে—যেটি পরিবেশের প্রতি খুব সহায়ক হবে না। কাজেই প্রযুক্তিই আমাদেরকে উন্নয়ন ও পরিবেশ উভয়বিধ চাহিদা মেটাবার সুযোগ করে দেবে বটে, কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বকে নিয়ে পুরো পৃথিবীকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ফসিল জ্বালানির উপর সে প্রযুক্তিকে নির্দিষ্ট রাখলে শেষ অবধি লাভ বেশি হবে না। ধনী দেশগুলো বহু ব্যয় যেটুকু এগোবে, অন্যত্র বেঁচে থাকার আর অপরিহার্য উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী তাগিদ তাকে ততখানিই পিছিয়ে নেবে। আর ধনী দেশগুলোতেও প্রবৃদ্ধির লাগামহীন তাড়না পরিবেশ সচেতনতাকে সব ক্ষেত্রে সফল হতে দেবে কিনা তাও বিচার্য।

# সৌর বিদ্যুতের হাতছানি

১৯৯২ সালের জুনে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে যে ধরিত্রী সম্মেলন হয়ে গেছে সেখানে বিশ্ব পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সকলের করণীয় নির্ধারিত হয়েছে। করণীয়গুলোর মধ্যে দুটি বিষয় খুব গুরুত্ব পেয়েছে—এক : ফসিল জ্বালানি থেকে আবিষ্কৃত গ্যাস উদ্‌গীরণ বন্ধ করে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা। দুই : বিশ্বের যে জীব বৈচিত্র্য হাজার বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে তাকে রক্ষা করা। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গেই আমাদের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। জলবায়ু পরিবর্তনের যে আশংকা দেখা দিয়েছে তার ভুক্তভোগী হবো বাংলাদেশে আমরাই সবার আগে দেশের বিশাল অংশ জলমগ্ন হবে বলে। আর জীব বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমাদের এই শ্যামল দেশ যে সম্পদ এখনো ধারণ করে আছে তাই হতে পারে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে আমাদের জন্য রক্ষা কবচ।

অথচ এই আমরাই এমন একটি জিনিসের প্রতি উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছি—যা একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানীয় পরিবেশ দূষণ রোধে বিরাট ভূমিকা নিতে পারতো, আমাদের মূল্যবান সম্পদ জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারতো এবং উন্নয়নের অপরিহার্য নিয়ামক শক্তি উৎস সম্পর্কে আমাদেরকে নিশ্চয়তার আশ্বাস দিতে পারতো। এই জিনিসটি হলো সৌর বিদ্যুৎ।

জীবনের ও উন্নয়নের যে কোন কর্মকাণ্ডে শক্তির প্রয়োজন হয়। জীবনের মান ও উন্নয়নের মাত্রা যত বাড়তে চাইবো শক্তি উৎসের পরিমাণ প্রয়োজন হবে প্রায় সমানুপাতিকভাবেই বেশি। উন্নয়নের ফসল যদি সব মানুষের কাছে যেতে হয় তাহলে শক্তি উৎসকেও সব মানুষের কাছে যেতে হবে। এখন এই পরিমাণটুকু আমাদের যা রয়েছে তা এতই অকিঞ্চিৎকর যেসব মাপকাঠিতেই সবার প্রায় সর্বনিম্নে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য শক্তি উৎস সংগ্রহ করছি আমাদের অতিমূল্যবান, ভবিষ্যতের রক্ষা কবচ শ্যামলিমা ধ্বংস করে। নিজের ও আমদানি করা যেটুকু বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার করছি তা আমাদের এই ছোট ঘনবসতির দেশকে পরিবেশ দূষণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে—বিশেষ করে শহর নগরগুলোকে। এভাবে চললে বন সম্পদ শেষ হবে, পরিবেশও যাবে। আর বাণিজ্যিক জ্বালানির কথায় আসলে আমাদের নিজেদের গ্যাস ফুরাবে ৩০

বছরের মধ্যে, সারা বিশ্বেও নাকি এই প্রাকৃতিক গ্যাস বছর ষাটেকের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে। তেল তো ৩৪ বছরের মধ্যে ফুরাবার কথা। কয়লা আরো বেশি দিন—প্রায় ১৭৫ বছর আরো যাবে বলে আশা আছে বটে দুনিয়ায় কিন্তু পরিবেশের দারুণ ক্ষতি করে বলে কয়লা জ্বালাতে সবারই ভয়।

তাই সৌর বিদ্যুতের কথাটি উঠেছে। এটি সূর্যের আলোকে সরাসরি বিদ্যুতের পরিণত করে। এ তৈরি করার উপায় হলো সৌরকোষ। সৌরকোষ সাজানো পাতলা প্যানেল সূর্যের আলোতে মেলে দিলেই হলো। এখানে কিছু পোড়ে না, কোন কিছু উদগীরণ হয় না, এমনকি কোন কিছু ঘোরেও না, নড়েও না। ব্যবহারের ফলে সৌর প্যানেলের কোন কিছু ক্ষয়িত হয় না বা বদলায়না বলে এটি স্থায়ী জিনিস ১৫-২০ বছরের জন্য তো বটেই। এ যাকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে সেই সৌরশক্তি অফুরন্ত, অবারিত। এমনকি মেঘলা দিনে বিক্ষিপ্ত যে আলো আসে তাতেও সৌর প্যানেল কাজ করে। পরিবেশের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই—না শ্যামলিমাকে, না বিশুদ্ধ বাতাসকে এটি প্রভাবিত করে।

সৌর বিদ্যুতের একটি মস্ত সুবিধা এতে বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। একজন গেরস্ত তাঁর ঘরের সামান্য প্রয়োজন মেটাতে ছোট একটি প্যানেল নিজে নিজে ব্যবহার করতে পারেন। আবার অনেকগুলো প্যানেলের সমন্বয়ে বড় গ্রিড ব্যবস্থাও গড়ে তোলা যায়। শক্তির উৎস সর্বত্র সমানভাবে বিকীর্ণ বলে এখানে দুর্গমতা বা কেন্দ্রীয় সরবরাহের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার নেই। ছোট হোক আর বড় হোক এর দক্ষতাও সমান থাকে। দামের দিক থেকেও, শক্তি উৎপাদনের দিক থেকেও।

সৌর বিদ্যুতের প্রযুক্তি আজ অনেক এগিয়েছে; বাজারও এগিয়েছে তবে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে নয়। এই এগোনোটা আমাদের দেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অত্যন্ত জরুরী—আমাদের অবদানটিও এতে যোগ করা উচিত।

সৌরকোষের যে পদ্ধতিটি এখন ব্যাপক আকারে অনুসৃত হচ্ছে, বাজারে আসছে তার মধ্যে দুটি সমস্যা রয়ে গেছে। সিলিকনের নিরবিচ্ছিন্ন কেলাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি এই কোষের উৎপাদন পদ্ধতি জটিল, দাম পড়ে বেশি। অকেলাসি, সিলিকনের উপর ভিত্তি করা সৌরকোষ ক্যালকুলেটর, ঘড়ি, রেডিও ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছে—আমাদের দেশেও। বড় আকারে শক্তি উৎপাদনের জন্যও এটিই হবে একটি যথাযথ পদ্ধতি—কারণ এতে ব্যাপক উৎপাদন সহজ, দামও অপেক্ষাকৃত কম, দ্রুত আরো কমে যাবে। সৌরকোষের আধুনিকতম প্রযুক্তিগুলো—যেগুলো এখনো বাজারে আসেনি—তাও দাম ও উৎপাদন ব্যাপকতার দিক থেকে আশার সঞ্চার করেছে। মনে হচ্ছে বাজার থেকে কাপড় কেনার মত গজে গজে নমনীয় পাতলা সৌরবিদ্যুৎ উৎস কিনে এনে মেলে দেয়া যাবে—এমন দিন খুব বেশি দূরে নেই।

নাটকীয়ভাবে দাম যদি নাও কমে, তবুও একটি বিষয় বিবেচনা করলে সৌরবিদ্যুতের জুড়ি এখনো নেই। শুরুতে এতে বিনিয়োগ একটু বেশিই। কিন্তু এই দাম উসুল হয়ে যাবার পরও এটি আরো বহুদিন কাজ দেবে। এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব, জ্বালানি ব্যয়হীনতা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়হীনতা এই দাম উসুলের সময়কে যথেষ্ট এগিয়ে দেয়।

আশা করা হচ্ছে যে সামনে ব্যাপক উৎপাদন শুরু হলে অকেলাসিত সিলিকন ভিত্তিক সৌর প্যানেলের দাম দেড় বছর ব্যবহারেই উসুল হয়ে যাবে—বিকল্প বিদ্যুতের তুলনায়। এরপর থেকে পুরোটাই নিখরচায়।

এখন প্রশ্ন হলো যে জিনিসটি আমাদের উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করে সকলের সুষম উন্নয়নের জন্য বৈপ্লবিক অবদান রাখতে পারে, শক্তির জন্য ভবিষ্যতে একমাত্র তার উপর নিশ্চিত নির্ভর আমরা করতে পারি—তার সম্পর্কে আমরা কতখানি উৎসাহ দেখাচ্ছি? ভবিষ্যতে এর ব্যাপক ব্যবহার হবে সেই লক্ষ্যে আজকের ন্যূনতম প্রস্তুতিটিও কি আমরা নিচ্ছি?

ভাল করেই জানি যথাযথ টেকসই শক্তি উৎসের ব্যবস্থা না হলে উন্নয়ন হবে না, পরিবেশ বিপন্ন হবে, এমন কি জাতি হিসাবে আমাদের অস্থিত্বও বিপন্ন হতে পারে। এও জানি যে জলবায়ু পরিবর্তন জীব-বৈচিত্র্য বিলোপ এসব আশঙ্কা বিশ্বে কারো জন্যই আর অমূলক আশঙ্কা নয়, আমাদের জন্য তো নয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য তালিকায় আমাদের নাম শীর্ষে। আজ যদি আমরা আমাদের চিন্তা ও প্রস্তুতিকে অন্তত আংশিকভাবেও সৌরবিদ্যুৎ মুখী করতে পারতাম তাহলে শক্তি উৎসের নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও জৈব সম্পদের নিশ্চয়তার বিধানও অনেক খানি কমাতে পারতাম।

আমাদের জন্য এই প্রস্তুতির মানে হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নীতিতে এই প্রযুক্তিটিকে গুরুত্ব প্রধান এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করা। জিনিসটি যেহেতু একেবারেই নতুন আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোরও প্রয়োজন হতে পারে। একই সঙ্গে গণ-সংযোগ, এখনই যথাসম্ভব এর ব্যবহারকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ, বিদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দিগন্তে দেখা যায় এই সম্ভাবনার ভবিষ্যতকে আমরা অবহেলা করতে পারি না।

# বায়ুকলের নূতন ভবিষ্যৎ

নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রতি বিশ্বজোড়া আগ্রহের একটি বড় কারণ হলো পরিবেশের দিক থেকে এর আকর্ষণীয়তা। এই নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে দুনিয়ার নানা দেশে একটি বিশেষ প্রযুক্তি অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেটি সম্বন্ধে আমাদের দেশে চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা খুব কমই হয়েছে। এটি হচ্ছে—বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা। নৌকার পালে বায়ুশক্তির ব্যবহার আমরা হাজার বছর ধরে করছি। তবে এর আরো নানা যে ব্যবহার অন্যান্য বহু দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে সেগুলোর সঙ্গে আমরা তেমন পরিচিত নই। এক সময় বায়ুকল দুনিয়ার বহু দেশে গমে যাঁতি ঘুরিয়েছে, সেচের পানি তুলছে। আজ অবশ্য বায়ুকলের প্রযুক্তি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর তার প্রধান ব্যবহারটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। উন্নত দেশগুলোতে বায়ুশক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও তা এখন উল্লেখ করার মত একটি পরিমাণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশও বায়ু বিদ্যুতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পেছনে বড় তাগিদটি হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত তাগিদ।

বায়ুকলের আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে কম পরিবর্তন ঘটেনি। অতি আধুনিককালেও এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তবে আশির দশক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে বায়ুকল মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখতে বিমানের প্রপেলারের মত। পাখাগুলো সব ছিমছাম। বেশ হালকা পাতলা। পাখার পেছনে বিদ্যুৎ জেনারেটরটিও ছোটখাট ছিমছাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও তিনটি ব্লেডের পাখা ব্যবহৃত হচ্ছে, আজকাল দুই ব্লেডের পাখাও চালু হয়েছে।

এমনি এক একটি বায়ুকল থেকে বর্তমান ১০০ থেকে ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিমাণ শিগ্‌গির এক মেগাওয়াটে—পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। বায়ুকলের ওজন কমিয়ে এবং একই সঙ্গে এর আকার ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে

বায়ুবিদ্যুতের ব্যয় কমাবার চেষ্টায় ক্রমাগত গবেষণা চলছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এটি ব্যাপক বাস্তব ব্যবহারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে এখন প্রতি বছর প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট হারে বায়ু-বিদ্যুতের উৎপাদন শক্তি যোগ হচ্ছে। শিগ্‌গির মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২ শতাংশ বায়ুশক্তি থেকে আসবে। আর ২০৩০ সাল নাগাদ এই অনুপাত ১০ শতাংশের উপর গিয়ে দাঁড়াবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মোট বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ২০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন পর্যায়ে ফসিল জ্বালানি ও আনুসঙ্গিক পরিবেশ দূষণের কোন ভূমিকা নেই। সনাতন জ্বালানিগুলো আহরণ করতে গিয়ে খনি এলাকায় এবং জ্বালানির স্থানান্তরে যেভাবে পরিবেশ দূষিত হয় সেটি যেমন নেই তেমনি নেই জ্বালানি দহনে উৎপন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের উদগীরণ, এর ফলে বায়ুদূষণ এবং শেষ অবধি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বজোড়া দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ অবক্ষয়। অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের সঙ্গে বায়ু-বিদ্যুতের ব্যবহার চালু করে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবেশ অবক্ষয় সম্ভাবনা অনেকখানি কমিয়ে ফেলতে পারি। সেই সঙ্গে জ্বালানি উৎসের অভাবী আমাদের দেশে নিজস্ব অফুরন্ত শক্তি উৎসের একটি সুরাহা করতে পারি।

তবে সাধারণ অর্থে বা তুলনামূলকভাবে পরিবেশ দূষণহীন একথা বলে বিজ্ঞানীরা বায়ু-বিদ্যুতের সবকিছুকে ছাড়পত্র দিয়ে বসে আছেন এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে।

এক ধরনের দূষণের সম্ভাবনা এখানেও তাঁরা দেখতে পান। এর মধ্যে রয়েছে এক একটি এলাকায় অনেকগুলো বায়ুকল বসানোর ফলে এলাকার দৃশ্যের উপর এবং লোক বসতির উপর প্রভাব, এক সঙ্গে এতগুলো চরকি-সদৃশ বায়ুকল চলার যে শব্দ দূষণ স্থানীয় জনসাধারণের উপর তার প্রভাব পড়বে। স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের ক্ষতি, বিদ্যুৎ চৌম্বক নয়েজের সৃষ্টি ইত্যাদি।

দৃশ্যগত পরিবর্তনটি যে সবার কাছে নেতিবাচক হবে এমন কথা নেই। বর্তমানের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ছিমছাম্ বায়ুকলগুলো দেখতে মোটেই খারাপ কিছু নয়। শব্দ দূষণের ব্যাপারটি অবশ্য একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। চরকির উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহের শব্দ এবং জেনারেটরের গিয়ার বক্স থেকে আসা শব্দ মিলে কিছুটা শব্দ এতে উৎপাদিত হয় বৈ-কি। বাতাসের শব্দটি অপেক্ষাকৃত জোরালো হলেও বিরক্ত উৎপাদন করে দ্বিতীয়টিই বেশি, এর উচ্চ গ্রামের কারণে। তবে লোক বসত যদি বায়ুকল থেকে ৩০০ মিটারের অধিক দূরে রাখা যায় তাহলে এটিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কোন কোন পরিবেশবাদী স্থানীয় পাখিকুলের উপর বহু বায়ুকল সমৃদ্ধ বায়ুবিদ্যুৎ খামারের

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথা বলছেন। ঘূর্ণায়মান এতগুলো চরকির উৎপাতে পাখিরা স্থানচ্যুত হচ্ছে এমন কথা উঠেছে। এদের আঘাতে পাখি আহত হচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, বাসা বাঁধার জায়গা পাচ্ছে না ইত্যাদি।

তবে এসব অভিযোগের সঙ্গে তুলনা করতে হবে গুরুতর পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে এর ভূমিকার কথা। এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার পরিবর্তে বায়ুশক্তি ব্যবহার করলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড যাবে ১ কিলোগ্রাম। ৩০টি বায়ুকল যুক্ত একটি ছোট বায়ু বিদ্যুৎ খামার এভাবে ক্ষতিকর গ্যাস উদ্গীরণ কমাবে এর আয়ুকালের মধ্যে ৩০,০০০ মেট্রিকটন। এটি পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় একটি বড় রকমের অবদান বৈ-কি।

# উন্নয়ন ও জ্বালানি ব্যবহার

আরো উন্নয়ন মানে আরো বেশি হারে শক্তি উৎসের ব্যবহার—এই সমানুপাতিক ধারণাটি বহুকাল ধরেই সত্য ছিল, এখনো অনেকটা তাই রয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে শক্তি উৎস বলতে আমরা ফসিল জ্বালানিকে জেনেছি কিছু বিদ্যুৎ এবং আধুনিককালে নিউক্লিয়ার শক্তির কথা বাদ দিলে। যদিও নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের ভিত্তিতে শক্তি ব্যবহারের একটি নব দিগন্ত আমরা আনার প্রত্যাশী—উন্নয়ন আর প্রবৃদ্ধির অভিলাষী বিশ্বের দেশে দেশে ফসিল জ্বালানি ব্যবহার বাড়ছে বৈ কমছে না। কাজেই ফসিল জ্বালানিই দহনে সৃষ্ট-পরিবেশ দূষণের বিস্তারে বিরাম নেই।

এর সমাধান হতে হলে উন্নয়ন ও শক্তি উৎসের মধ্যে উল্লেখিত সমানুপাতিকতার অবসান ঘটাতে হবে। এবং বহু উন্নত দেশে তাই করা হচ্ছে। অবশ্য মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জি.ডি.পি'র তুলনায় জ্বালানি ব্যবহারের চাহিদা উন্নয়নের প্রথম অবস্থায় দ্রুত বাড়লেও যথেষ্ট উন্নয়নের পর এটি এমনিতেই কমে আসে। কিন্তু এখন এটিকে ইচ্ছা করে বিশেষভাবে কমিয়ে আনার চেষ্টা চলছে পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোতে মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার শতকরা ৬ ভাগ কমেছে। অথচ এই সময়ে এসব দেশে মাথাপিছু জিডিপি বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার ২৪% কমিয়ে এবং জাপান ৩২% ভাগ কমিয়ে এই ব্যাপারে আরো চমকপ্রদ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। উন্নয়ন গতি বজায় রেখে এভাবে জ্বালানি ব্যবহার কমানো কেমন করে সম্ভব হলো? ঐ শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এর একটি বড় উপায় ছিল শিল্পের প্রকৃতির পরিবর্তন। শিল্প উৎপাদনের প্রথম পর্যায়েই সাধারণত সবচেয়ে বেশি জ্বালানি ব্যয় হয়—যেমন কাঁচামাল থেকে লোহা বা সিমেন্টের মত ভারী উপাদানসমূহ সৃষ্টিতে। পরবর্তী পর্যায়সমূহে জ্বালানি ব্যবহার অনেক কমে যায়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় দেখানো হয়েছে যে উৎপাদনে এক ডলার মূলধন ও বেতন ব্যয়ের জন্য জ্বালানির ব্যয় হয় ধাতু শিল্পে সোয়া ডলার, অক্সিজেন ক্লোরিন ইত্যাদি গ্যাস তৈরির শিল্পে সিকি ডলার, হিমায়িত খাদ্য শিল্পে ৫ সেন্ট, আর কম্পিউটার শিল্পে মাত্র দেড় সেন্ট। আর ইতোমধ্যে উন্নত ও ধনী

দেশগুলোতে শক্তি নির্ভর শিল্পগুলোর বিনিময়ে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পগুলোই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। প্রথমোক্তগুলো চলে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশে। এভাবে পরিবেশের দিক থেকে এক নতুন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হতে চলেছে। বড়রা অধিক দূষণ সম্পন্ন শিল্পগুলো ছোটদের কাছে চালান করে দিতে পারছে।

অবশ্য জ্বালানি ব্যবহার কমাবার ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ের অবদান রয়েছে। এটি হচ্ছে ক্রমেই অধিকতর জ্বালানি-দক্ষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন। এ বিষয়টির প্রতি এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে—তাও প্রধানত পরিবেশের স্বার্থেই। বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্রের কথাই ধরা যাক। এ শতাব্দীর শুরুতে এর তাপীয় দক্ষতা ছিল শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। অর্থাৎ ১০০ ভাগ তাপ সৃষ্টি করে—তার থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যেত মাত্র ৫ ভাগ। ১৯৫০ সাল নাগাদ এই দক্ষতা বেড়ে হয় ২৫%। আর এখন এটি এসে পৌঁছেছে ৫০% ভাগে। সত্তর আর আশির দশকে জ্বালানির মূল্য দারুণভাবে বৃদ্ধি পেলে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জ্বালানির দক্ষতা বাড়ানো ছাড়াও জ্বালানি সংরক্ষণের নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ঘরের তাপ-নিরোধিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা কমে যায়। কোম্পানিসমূহে জ্বালানি সাশ্রয়ে কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। আবার দেখা যায় ১৯৮৬ সালের দিকে তেলের দাম পড়ে গেলে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও বেশ কিছু ধীর হয়ে পড়েছে।

আসলে অর্থনীতির মুক্ত নীতিতে ভাসমান বলে এদিক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষ যতখানি করতে পারত ততখানি করছে না মোটেই। নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের বিকাশের ক্ষেত্রেও কথাটি খাটে। এক হিসাবে দেখা গেছে উন্নত বিশ্বের জ্বালানি চাহিদা শুধুমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধি করেই এখনই শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব। আর পৃথিবীর সর্বত্র নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শতকরা বেশ কয়েকভাগ ফসিল জ্বালানি দহন এখনই কমিয়ে ফেলা যায়। গবেষণার গতি আগের মত বজায় রাখবে উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতি আরো অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে শক্তিমান বাতিগুলোর গরজের উপর।

এদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে আমরা কোনভাবেই জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমাতে পারছি না, অদূর ভবিষ্যতে এটি বাড়ানো বৈ কমানোর কোন উপায় আমাদের নেই। তাই এদিক থেকে পরিবেশ দূষণের ক্রমবর্ধমান চাপের সম্মুখীন হবো আমরাই। সচেতনতা ও উদ্যোগের প্রয়োজন তাই এখন আমাদের বেশি পরিবেশের সঙ্গে—ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আধুনিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎসের বিষয়টি।

# লাঠি না ভেঙে সাপ মারা

সম্প্রতি একটি বেশ চমকপ্রদ গবেষণা কর্ম চালানো হয়েছিল। নানা দেশের বিজ্ঞানীদের দলকে ডেকে একটি সমস্যা তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল। সমস্যাটি পুরনো—সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না এমন উপায় বের করতে হবে। সাপ হলো পরিবেশ দূষণ—বিশেষ করে জ্বালানি দহনের ফলে বাতাসে যে দূষণ সৃষ্টি হয় তা। আর লাঠিটি হলো উন্নত দেশের বর্তমান জীবন যাত্রার স্টাইল। বলাবাহুল্য গবেষণাটির আয়োজন করেছে ঐ উন্নত দেশগুলোই ইউরোপীয় গোষ্ঠী। সাপ মারতে তাঁরা দৃঢ় সংকল্প। ২০০০ সালের মধ্যে বাতাসে উত্তীর্ণ কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ তাঁরা একেবারে স্থির করে দিতে চান ১৯৯০ সালের পরিমাণে আর একটুও যেন না বাড়ে। অথচ শক্তির চাহিদা কমানো চলবে না। বর্তমান জীবন যাত্রার স্টাইল অব্যাহত সে চাহিদা কমানো কি আদৌ সম্ভব? অতএব উপায় কি অঘটনঘটন পটিয়সী বিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া। ঐ গবেষণা কর্মটির নাম দেয়া হয়েছে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম শেষ পর্যন্ত সমাধানের যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে তাতে শক্তির চাহিদার উপর জোর না দিয়ে, জোর দেয়া হয়েছে সার্ভিসের চাহিদার উপর। যদি কম শক্তি ব্যবহার করেই একই সার্ভিস পাওয়া যায় তাহলেই তো হলো। জ্বালানি পুড়বে কম, দূষিত গ্যাস যাবে কম, অথচ আরাম আয়েসের কোন ঘাটতি পড়বে না—সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙ্গলো না। এক কথায় শক্তির সব রকম ব্যবহারকে আরো দক্ষ করে তুলতে হবে। এটি যে শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা নয়। এই বিশ্লেষণে ক্র্যাশ মডেলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে সুইডেন এক দিকে তার সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্রগুলো একে একে বন্ধ করে দিয়ে, অন্যদিকে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড উদগীরণ কমিয়েও তারা সার্ভিস চাহিদা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বাজার অর্থনীতি নিজেই এ ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখে একে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ মানুষকে যদি চাহিদা ও সরবরাহের অবাধ বাণিজ্যের মধ্যে থাকতে দেয়া হয় তাহলেই মানুষ নিজ থেকে আরো

দক্ষ, আরো কম দূষণকারী প্রযুক্তিগুলো নিজেদের ব্যবহারের জন্য বেছে নেবে। কিন্তু এই বাজার অর্থনীতিই যথেষ্ট নয়, এ কথাও ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ধরা পড়েছে। শক্তি দক্ষ প্রযুক্তিকে চালু করার জন্য সরকারকেও সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে। ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে যে সৌরতাপে পানি উত্তপ্ত করা, বাড়িঘর গরম করতে বায়োগ্যাসের ব্যবহার, সৌরবিদ্যুৎ চালু করা এবং দক্ষ গাড়ি ও ওয়াশিং মেশিনের প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন।

ফসিল জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার সম্ভব যদি বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্রে জ্বালানির সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও অপচিত তাপটাকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ধরে নিয়ে ব্যবহার করা যায় তাতে গ্যাস উদগীরণ কমবে ২.৭%। তেল আর কয়লার বদলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা গেলে এক লাফে কমবে ৪.৫%। আরো ১.৫% কমবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ফলে। তাদের মধ্যে কোন কোনটি সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বনির্ভরভাবে চালু হতে বাধা নেই, যেমন—বায়ু বিদ্যুৎ, ছোট আকারের জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আরো দক্ষ বৈদ্যুতিক চুলা এবং আবর্জনা পুড়ে শক্তি উৎপাদন।

পারমাণবিক শক্তির বিষয়টি একেবারে বাদ দেয়া হয়নি। ক্র্যাশ মডেলে এর বৃদ্ধিতে যে সীমা টেনে দেয়া হয়েছে সেটুকুর ফলে গ্যাস উদ্গীরণ কমবে ০.৩ শতাংশ। পারমাণবিক শক্তির আর বেশি বিস্তার অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে স্রেফ আর্থিক লাভজনকতার বিচারেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যানবাহন খাত। ক্রমে ঐ অঞ্চলে সড়ক যাতায়াতের পরিমাণে বিশাল বৃদ্ধি ঘটবে এটি অবধারিত। গাড়ি থেকে ক্ষতিকর গ্যাস উদ্গীরণের মোট পরিমাণ এক রাখতে হলে গাড়িগুলোকে যত দক্ষ করা সম্ভব তার সবই করতে হবে।

আর তাতেও যথেষ্ট হবে না, ২০১০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে উদ্গীরণ ১০% কমাতে হলে গাড়িতে তেল ব্যবহারের মোট পরিমাণ ৩% কমতেই হবে। গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে তা কমানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। এটি মোটেই আশাপ্রদ নয়।

এমন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য কি ধরনের হস্তক্ষেপ করা হবে সে সম্বন্ধে নীতিগত ইচ্ছা প্রকাশ করলেও এখনো ঠিক কিভাবে সেটি করা হবে তা স্পষ্ট নয়। শুধু একটি ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে তা হলো জ্বালানি ব্যবহারের উপর কর আরোপ। যত দক্ষভাবে শক্তি উৎপাদন করবে সে হিসাবে এই কর কম হবে। আবার যত কম গ্যাস উদগীরণ করবে সে হিসাবেও কম হবে। কিন্তু একই সঙ্গে এই মতও প্রকাশ করা হচ্ছে যে কর থেকে প্রাপ্ত অর্থকে শক্তি-দক্ষতা বাড়াবার কাজে গবেষণা ও উপযোজনে ব্যয় করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই গবেষণা উন্নয়নের উপরেই সাফল্য নির্ভর করছে।

সাফল্য হয়তো ইউরোপীয় গোষ্ঠীর উন্নত দেশগুলোতে আসবে। কিন্তু সেটি হবে শুধু সীমিত সাফল্য। কারণ সমস্যাটি ঐ দেশগুলোর ভেতরে সমাধান করাটাই যথেষ্ট নয়। পরিবেশের পুরো ব্যাপারটি বিশ্বজনীন এবং সমাধান করতে হবে পুরো বিশ্ব জুড়েই। আর এ কাজের জন্য যাদের সম্পদ আছে সে সম্পদ তাদের ব্যবহার করতে

হবে—নইলে শেষ পর্যন্ত তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সম্পদকে এভাবে বিশ্বের জন্য ব্যবহার করতে হলে উন্নত দেশের জীবন যাত্রার স্টাইলে একেবারে হাত না দিয়ে সেটি সম্ভব হবে না। সেখানে যে প্রাচুর্য, যে অপচয় সেটি যে আদৌ অপরিহার্য নয় এই স্পষ্ট সত্যটি তাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে। লাঠি না ভেঙে, এমনকি লাঠিকে একেবারে না সীমিত করে সাপ মারার যে প্রকল্প সেটি শুধু আত্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনাতেই সম্ভব, বিশ্ব বাঁচাবার পরিকল্পনায় নয়।

# তেজষ্ক্রিয়তা আমাদেরও আকাঙ্ক্ষা

নগর জীবনে যত রকমের দূষণ ঘটতে পারে তার অধিকাংশেরই শিকার আমাদের নগরী, কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশি রকমে। তবে একটি দিক থেকে আমরা বোধ হয় কিছুটা ভাল আছি, অন্তত আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক আশঙ্কামুক্ত। এটি হলো তেজষ্ক্রিয়তার ফলে সৃষ্ট দূষণ। তেজষ্ক্রিয় বস্তুর উপর ভিত্তি করা কর্মকাণ্ড আমাদের দেশে তেমন বেশি নেই। পৃথিবীর বহু দেশ নিজেদের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। আমাদের দেশে এখনো শক্তির উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহৃত হচ্ছে না। তাই সরাসরিভাবে চরম তেজষ্ক্রিয়তার দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আমাদের নেই। কিন্তু তাই বলে এদিক থেকে আমরা কি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। কিছুদিন আগে তেজষ্ক্রিয় গুঁড়া দুধ যেভাবে আমাদের গৃহে প্রবেশ করছিল তাতে এ কথা নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারি না।

কোন উন্নত দেশে সব রকম প্রাচুর্য ও সাবধানতার মধ্যে বাস করেও মানুষ পারমাণবিক চুল্লির নৈকট্য নিয়ে এত উদ্বিগ্ন? কেন এ নিয়ে সেখানে এত আন্দোলন? চেরনোবিলের একটি দুর্ঘটনা কেন একটি বিশাল ভূখণ্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল? কেন ঘটনার অনেক দিন পর তার থেকে অনেক দূরের আমাদের দেশের বাবা মা শিশুর জন্য দুধ কিনতে গিয়ে আশংকায় বিচলিত হয়েছিল? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে তেজষ্ক্রিয়তার দূষণটি কি? কেনইবা তা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর, এমন কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্রের আপনা আপনি ভেঙে গিয়ে তার থেকে বিভিন্ন রশ্মি নির্গত হবার ঘটনাই তেজষ্ক্রিয়তা। এর আবিষ্কারের গোড়ার দিকে যাঁরা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন তাঁদের অন্যতম মাদাম কুরী। তিনি অকালে মারা গিয়েছিলেন। লিউকেমিয়া নামে রক্তকোষের ক্যানসারে। এটি যে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র তেজষ্ক্রিয়তার মধ্যে থাকার কারণেই হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তেজষ্ক্রিয়তার মারাত্মক প্রভাব গোড়া থেকেই মর্মান্তিকভাবে পেয়েছি এর একজন আবিষ্কারক এই মহীয়সী নারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

তেজস্ক্রিয়তার ডোজ মাপার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় র‍্যাড। এটি একটি ছোট একক। দৈনিক ৫০০ র‍্যাড তেজস্ক্রিয়তা শরীরে গেলে ২ দিনে মানুষের মৃত্যু অবধারিত। এক লক্ষ র‍্যাডের মত তেজস্ক্রিয়তায় উন্মুক্ত হলে মৃত্যু তাৎক্ষণিক। কিন্তু দৈনিক মাত্র ৬০ র‍্যাডে ১০ দিন কাটালেই মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রচুর, জন্মের মত পঙ্গু করে ফেলা নানা ব্যাধির শিকার তো হতে হয় অবশ্যই।

তীব্র তেজস্ক্রিয়তার শিকার হলে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। বমি, চরম দুর্বলতা এ সবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে এটি শরীরের রক্ত কোষকে আক্রমণ করে এবং প্রধানতর রক্তশূন্যতা, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং প্রদাহে রোগী মারা যায়। কয়েকদিনের মধ্যে এমনকি যদি নাও ঘটে, তবুও অনেক দিন পর তিলে তিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে যায়। এসব হলো হঠাৎ করে তীব্র তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হবার ব্যাপার। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম ডোজেও যদি দীর্ঘদিন ধরে কেউ উন্মুক্ত থাকে তাহলেও ক্ষতির সম্ভাবনা কম নয়। তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে এবং শেষ অবধি মৃত্যু বা চরম ভোগান্তির কারণ ঘটায়।

তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াগুলা ছাড়া এর বহু রকমের পরোক্ষ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর ফলে মানুষ দ্রুত বার্ধক্য ও জরায় আক্রান্ত হয়, আয়ুষ্কাল কমে যায়। নানা ধরনের ক্যানসার সৃষ্টির প্রবণতা এটি অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। শরীরের নানা গ্রন্থির উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়। যেমন তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আক্রান্ত শিশুদের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে থাইরয়েড গ্রন্থি নষ্ট হবার ফলে।

তেজস্ক্রিয়তার পরোক্ষ ফলাফলের মধ্যে একটি মারাত্মক বিষয় হলো একটি মানুষের জনন কোষে এমন বিশৃঙ্খল পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে বংশগতি নির্ধারক জীনে বিকৃতি দেখা দিতে পারে। এর পরিণতি হতে পারে বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রস্থ সন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে। এভাবে দেখা যায় যে তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব এক পুরুষেই শেষ হয়ে যায় না। বরং এর জের চলতে থাকে পুরুষানুক্রমে। অন্য দূষণের তুলনায় তেজস্ক্রিয় দূষণ তাই এক দিকে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে ভয়াবহ, অন্যদিকে এর সুদূর প্রসারী ফলও অনুরূপভাবে ভয়াবহ।

এখন আসছে সেই অবধারিত প্রশ্নটি। এই যে মারাত্মক দূষণ প্রক্রিয়াটি আমরা তার কবলে পড়তে পারি কি রকম পরিস্থিতিতে। এর মধ্যে একটি সম্ভাবনা আমাদের খুব ভালই জানা আছে, সে হলো বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা। সেটি ব্যাপক ভিত্তিতে বেধে গেলে আমাদের কারোই আর তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু তা ছাড়াও অনুরূপ আরো আশংকা রয়েছে। চেরনোবীলের মত দুর্ঘটনা তো বটেই, নিয়মিত ভিত্তিতে পারমাণবিক ভস্ম কোথায় কিভাবে জমা করছি, তাও এর উৎস হতে পারে।

# পারমাণবিক শক্তির বিপত্তি

দেশের, এমন কি অঞ্চলের বাইরে তার উৎস, অথচ আমাদের মত ঘন বসতির জনপদে দ্রুত পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটাতে পারে এমন মোক্ষম জিনিস হলো পারমাণবিক শক্তিজনিত দূষণ। সত্যিকার পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে না হয় বাদই দেয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াই প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির নামে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের যে শিল্প গড়ে উঠেছে তার বাস্তব দৈনন্দিন প্রক্রিয়াটিও আশঙ্কিত হবার মত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৮৫ সালে সারা দুনিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির যে হার বিরাজ করছিল সেই হিসাবে যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম এবং পারমাণবিক বর্জ্য তৈরি হয় তাতে দৈনিক ২০ থেকে ৪০ জন মানুষ এর শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মধ্যে অস্ত্র পরীক্ষার বিষয়টি ধরা হয়নি। উন্মুক্ত অবস্থায়, এমন কি ভূগর্ভেও যেসব পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ঘটে তার ফলে স্থানীয়ভাবে এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটে অনেক বেশি পরিমাণে।

পারমাণবিক অস্ত্রের পুরো বিষয়টি বাদ দিলেও অন্যভাবেও পারমাণবিক দূষণের মারাত্মক সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আজ বিশ্বের নানা জায়গায় অনেকগুলো পারমাণবিক চুল্লি রয়েছে। ২২ টি দেশে আড়াই শ'রও বেশি শক্তি উৎপাদনকারী বড় আকারের চুল্লি রয়ে গেছে। এর সবই যে শিল্পোন্নত দেশসমূহে তাও নয়। বেশ কিছু রয়েছে উন্নয়নশীল দেশেও। এগুলো থেকে বিশ্বের বিদ্যুৎ সরবরাহের মাত্র দুই শতাংশ চাহিদা পূর্ণ হয়। অথচ পরিবেশ দূষণের মারাত্মক পরিচিত দিক দিয়ে এদের বাস্তব ও সম্ভাব্য অবদান অনেক বেশি। পারমাণবিক চুল্লি এখন এত বেশি ঘনত্বে গড়ে উঠছে যে, যুদ্ধের সময় বা কোন সন্ত্রাসবাদী পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করেই এই অস্ত্রের ফল লাভ করা সম্ভব। শত্রু পক্ষের পারমাণবিক চুল্লিতে সাধারণ অস্ত্রের আঘাত হেনে সেই বিশেষ অঞ্চলকে তো বটেই আরো বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে চরম পরিবেশিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দেয়া এখন অপেক্ষাকৃত সহজ। অতীতে নেহাৎ দুর্ঘটনাক্রমে বিভিন্ন পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে যা ঘটেছে, সেটি একথা স্পষ্ট প্রমাণ করেছে।

পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে সংঘটিত দুর্ঘটনার সবগুলোর কথা বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশিত হয়নি। যেগুলো হয়েছে

তাদের সংখ্যা বা গুরুত্ব মোটেই কম নয়। ১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যের কাম্ব্রিয়ার উইন্ডস্ক্যালে পারমাণবিক চুল্লিতে আগুন লাগলে এর চতুর্দিকে ২০৭২ বর্গ কিলোমিটার স্থান দূষিত হয়ে পড়ে। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার উরালে একটি পারমাণবিক বর্জ্য সংরক্ষণাধার বিস্ফোরিত হলে বিস্তীর্ণ জায়গা তেজস্ক্রিয় অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়টে একটি ফাস্ট ব্রীডার রিয়্যাকটরের কেন্দ্রীয় অংশ গলতে আরম্ভ করলে মারাত্মক দূষণের হুমকির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৬৯ এবং ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলরাডো এবং নিউইয়র্ক প্লুটোনিয়ামের সংরক্ষণাগারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। ১৯৭৬ ও ১৯৮১-তে উইন্ডস্ক্যাল পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রে আরো দুটি প্রধান দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর একটিতে ২০ লক্ষ লিটার তেজস্ক্রিয় পানি এর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারিসবার্গে থ্রি মাইল্‌স আইল্যান্ড পারমাণবিক চুল্লিতে চালনাকারীর সামান্য ভুলে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের চুল্লি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয় গ্যাসের বিস্তীর্ণ মেঘ। ঐ এলাকাকে আবার স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করতে দীর্ঘ ছয় বছর লেগে গিয়েছিল।

সাম্প্রতিককালের বিশ্বে সবচেয়ে মারাত্মক পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ইউক্রেনের চেরনোবিলে। এর মাধ্যমে মানুষ শিউরে উঠে লক্ষ্য করলো একটি মাত্র দুর্ঘটনা কেমন করে একটি পুরো মহাদেশকে এমন কি তার সীমানা ছাড়িয়ে জন জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। দুর্ঘটনার বহু মাস পরেও প্লুটোনিয়ামসহ নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসের সঙ্গে ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুসারে ইউক্রেন অঞ্চলের প্রায় লাখখানেক মানুষ সরাসরি তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছে। আরো অনেক ইউরোপীয়ের ক্যান্সার সৃষ্টি হয়তো চেরনোবিল দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

দুর্ঘটনা নিয়ে সবাই শঙ্কিত বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা আরো বেশি প্রতিদিন যা স্বাভাবিকভাবে ঘটছে তাকে নিয়ে। তা হলো পারমাণবিক চুল্লির বর্জ্য পদার্থগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলার সমস্যা। আজ এত বছর পরেও এর জন্য কোন সত্যিকার দীর্ঘস্থায়ী নিরাপদ সমাধি বের করা সম্ভব হয়নি। এক হিসাবে দেখা গেছে যে একমাত্র যুক্তরাজ্যেই শতাব্দীর শেষ নাগাদ দশ লক্ষ মেট্রিক টন নিম্ন ক্ষমতার, দেড় লক্ষ টনের বেশি মধ্যম ক্ষমতার এবং ৪ হাজার টনের বেশি মারাত্মক বিষক্রিয়া সক্ষম তেজস্ক্রিয় বর্জ্য চুল্লিগুলোর আশপাশে গুদাম ও পরিখাগুলোতে জমা হবে। এগুলোর একটি বড় অংশ পঞ্চাশ হাজার বছরের উপর পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। অথচ এদের বন্দোবস্ত স্থায়ীভাবে করার কোন উদ্যোগ এখনো ঘটছে না।

ভূগর্ভে বিশাল নিশ্ছিদ্র সমাধি হয়তো গড়ে তোলা সম্ভব, কিন্তু এরকম কিছু তৈরি করতে দিতে রাজি হবে কোন জনপদ? স্পষ্টত আজকের দুনিয়ার বড় পরিবেশ দূষণ সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রধান সমস্যার উৎস পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে। পুরো বিষয়টি উচ্চ প্রযুক্তির অন্তর্গত। হয়তো আমাদের নগরী, আমাদের দেশ, অদূর ভবিষ্যতে তেমন কোন বড় আকারে এই প্রযুক্তিতে সরাসরি শামিল হবে না। কিন্তু আমাদের আশপাশের বিশ্বে যা এদিক থেকে ঘটবে, তার প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত থাকবো না, এখনো নই।

কাজেই বিষয়টি কোনভাবেই আমাদের বিবেচনার বাইরে থাকা উচিত হবে না।

# তেজস্ক্রিয়তার হুমকি

তেজস্ক্রিয় বিকরণের ক্ষতিকর প্রভাব পরিবেশের বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য আশঙ্কা, যা সব সময় বিরাজ করছে। বিষয়টি কখনো সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আবার কখনো এটি মারাত্মকভাবে বিশাল জনপদ এমন কি পৃথিবীর একটি বড় অঞ্চলকেই হুমকির সম্মুখীন করতে পারে। এর প্রভাব একদিকে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে ভয়াবহ হতে পারে, অন্যদিকে ধীরে ধীরে অল্পে শরীরের মধ্যে রোগ জরার কারণ সৃষ্টি করতে পারে। এমন কি বংশগতির নিয়মকের বিকৃতি ঘটিয়ে এটি অনাগত সন্তানের জীবনকেও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

দেখা দরকার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎসগুলো কি কি হতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিংবা পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত কোন রকম কোন কর্মকাণ্ড না থাকা সত্ত্বেও সর্বত্র স্বল্প একটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আবহ সব সময় আমাদের চারদিকে বিরাজ করছে। একে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ পটভূমি বিকিরণ। সূর্য এবং মহাশূন্য থেকে শক্তিশালী নানা কণিকা সব সময় পৃথিবীতে এসে পড়ছে। পৃথিবীর শিলায় এবং মাটিতে নানা রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে যেখান থেকে নিয়মিত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে। পরিবেশের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে খাদ্যে বা নিশ্বাসে আমরা কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহের ভেতরেও গ্রহণ করছি।

এই পটভূমি বিকিরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কিছু হয় না। আমরা এক সঙ্গে সহাবস্থান করতে সক্ষম। কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো সব অঞ্চলে এই পটভূমি বিকিরণ সমান নয়। কোন কোন জায়গায় স্থানীয়ভাবে এটি নিরাপদ মাত্রার কিছু উপরেও চলে যেতে পারে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণেই। সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু মালভূমির জনপদে মহাশূন্য থেকে আসা বিকিরণ অধিক হতে পারে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে তেজস্ক্রিয় কণিকা ঘনীভূত হয় বলে ওখানে বিযুব অঞ্চলের চেয়ে অধিকতর পটভূমি বিকিরণ দেখা যায়। অনেক সময় এর আধিক্য ঘটে নেহাৎ কিছু স্থানীয় কারণে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কেরালা রাজ্যের সাধারণ পটভূমি তেজস্ক্রিয়তা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি। এর কারণ কাছাকাছি মাটিতে তেজস্ক্রিয় থোরিয়ামের অধিক অবস্থিতি।

পরিমাপ ও জরীপের মাধ্যমেই এক একটি এলাকার গড়পড়তা পটভূমি বিকিরণ জানা সম্ভব। এ সম্বন্ধে নিরাপদ অবস্থা নেয়াই ভাল। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় পটভূমি বিকিরণ জরিপ করে নিশ্চিন্ত হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তেজস্ক্রিয়তা আজ পরিবেশের প্রতি যেভাবে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মূল কারণ অবশ্য প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা নয়, মানুষের সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা। ১৯৪৫ সালের পর থেকে মানুষ পারমাণবিক শক্তির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। তখন থেকে এক দিকে যেমন যুদ্ধের জন্য বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পারমাণবিক চুল্লির মাধ্যমে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রথম ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের যে প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ভস্ম বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তা শুধু বিস্ফোরণের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই ভস্ম বায়ুমণ্ডলে গিয়ে বিস্তীর্ণ জায়গাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানকার মাটি, উদ্ভিদ, খাদ্য, পানি, পশুপাখি এবং মানুষের শরীরে পৌঁছে যায়।

আবার পারমাণবিক প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে শিল্প, চিকিৎসা, গবেষণা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রায়শই এ সবের সংস্পর্শে এখন মানুষকে আসতে হচ্ছে। বিশেষ করে যারা পেশাগত বা অন্যান্য কারণে এর সংস্পর্শে বেশি পরিমাণে আশঙ্কাজনক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এমন একটি ক্ষতিকর বিকিরণ যার সংস্পর্শ এড়ানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রায়ই আমাদের দেহের এক্সরে করতে হয়। সাধারণ অসুবিধা না হলেও ঘন ঘন অধিক সংখ্যায় দেহের এক্সরে নিতে যাওয়া একেবারে নিরাপদ নয়। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্য এতে ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার রয়েছে। শিল্প এবং গবেষণায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় কি ঘটছে তা বাইরে থেকে উদ্‌ঘাটন ও অনুসরণ সহজ হয়। আবার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে উদ্ভিদে, শস্যে বংশগতির পরিবর্তন ঘটানো যায় সুফল পাওয়ার জন্যই। তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদিকে পচনের হাত থেকে, আশু অঙ্কুরোদ্‌গমের হাত থেকে রক্ষা করে অনেক দিন সংরক্ষিত করা যায়। এর সবই কিছু কিছু আমাদের দেশে হচ্ছে, অন্তত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে। কাজেই এদের সব রকমের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হবার সময় আমাদের জন্য এসেছে।

# পারমাণবিক চুল্লির ভেতরে

পারমাণবিক বোমার কথা বাদ দিলে তেজস্ক্রিয় পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে সম্ভাব্য উৎস হতে পারে পারমাণবিক চুল্লি। সাধারণ ব্যবহৃত পারমাণবিক চুল্লিতে লম্বা সরু ধাতব নলের মধ্যে ভরে দেয়া হয় এর জ্বালানি ইউরেনিয়াম। চুল্লির ভেতর নিউট্রন কণার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে জমাট থাকা শক্তি বেরিয়ে আসে। এর দ্বারা উচ্চচাপে রাখা পানি বা গ্যাস উত্তপ্ত হয় যা আবার অন্য পানিকে উত্তপ্ত করে বাষ্প সৃষ্টি করে, আর তার চাপে ঘোরে টারবাইন, জেনারেটর; তৈরি হয় বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ উৎপাদনই অধিকাংশ পারমাণবিক চুল্লিগুলোর প্রধান লক্ষ্য।

আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার এখনো করছি না, তবে করার কথা চিন্তা ভাবনা করছি। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কোন কোনটা এভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করছে। উন্নত দেশগুলোতে পঞ্চাশের দশক থেকে এর প্রচলন ক্রমেই বেড়েছে। কিন্তু তাদের অনেকেই এ বিষয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে প্রধানত এর ফলে সম্ভাব্য মারাত্মক দূষণের কথা চিন্তা করেই।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বহু রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি হয়। এর মধ্যে রয়েছে আয়োডিন, ট্রিশিয়াম, সিজিয়াম, স্ট্রোনশিয়াম, ক্রিপটন ইত্যাদি। সব রকম চুল্লিতেই নানাভাবে লীক করে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরের পরিবেশে আসার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা আসেও। খুব সাবধান না হলে চুল্লির আশে পাশে বিস্তীর্ণ জায়গায় পানিতে, মাটিতে, বাতাসে গিয়ে এগুলো চরম দূষণের সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মারাত্মক হলো তথাকথিত ব্রীডার রিয়্যাক্টর। এরকম চুল্লিতে ইউরেনিয়াম জ্বালানি যা খরচ হয় তার চেয়ে অধিক প্লুটোনিয়াম নিজে আবার পারমাণবিক শক্তির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। দুনিয়ায় ইউরোনিয়ামের সরবরাহ যত কমে আসবে এভাবে নতুন জ্বালানি সৃষ্টকারী ব্রীডার রিয়্যাক্টর ততই বেশি হয়তো ব্যবহৃত হবে। কিন্তু চুল্লি থেকে শুধু তেজস্ক্রিয় পদার্থ লীক হবার সম্ভাবনা তাই নয়, এটি বিস্ফোরিত হবার আশঙ্কাও প্রচুর। সাধারণ চুল্লিতে নিউট্রনের গতি কমাবার জন্য মডারেটর হিসাবে যেখানে পানি ব্যবহৃত হয়, অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে ব্রিডার

রিয়্যাক্টরে ব্যবহার করতে হয় তরল সোডিয়াম। আর এটি যদি বিস্ফোরিত হয়, তাহলে পরিবেশে চলে আসে বোধ হয় দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বস্তু প্লুটোনিয়াম। হিসেব করে দেখা গেছে মাত্র আধ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম যদি সারা দুনিয়ায় সমানভাবে ছড়িয়ে যায়, তাহলে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দেহে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য তা যথেষ্ট হবে। অথচ দুনিয়ার বহু জায়গা এক একটি পারমাণবিক চুল্লি থেকেই বছরে ২০০ কিলোগ্রামের মত প্লুটোনিয়াম তৈরি হচ্ছে।

পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি ব্যবহৃত হয়ে যাওয়ার পর যে ভস্ম তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই তা থেকে তৈরি হয় বহু বিপদজনক বস্তু। একে বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়ে গিয়ে এর থেকে আরো কিছু ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি উদ্ধার করা যায়। তারপরও যা থাকে তার একটি গতি করা অত্যন্ত সমস্যাগুলো সংকুল হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো এমন জিনিস নয় যে পুড়িয়ে ফেললে ফুরিয়ে যাবে, পানিতে ছেড়ে দিলে বা মাটিতে পুঁতে ফেললে মিশে গলে নির্দোষ হয়ে যাবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ তার নিজের মত করে নির্দিষ্ট হারে অবক্ষয়িত হয়। বাইরের কোন কিছুই সেই গতিকে বদলাতে পারে না। এদের কোন কোনটির আয়ুষ্কাল ক্ষতি করার মত দীর্ঘ না হলেও অন্যগুলোর বহু বছর এমন কি বহু শত বার লেগে যায় নির্দোষ জিনিসে পরিণত হতে। ইতোমধ্যে এগুলো যদি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে, খাদ্য-শৃঙ্খলে ঢুকে এটি মানুষের দেহে এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহে ঢুকে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, পারমাণবিক চুল্লিতে বিক্রিয়ার সৃষ্ট পদার্থে শতকরা পাঁচ ভাগ হলো আয়োডিন-১৩১। এই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পরিবেশে যেতে পারলে অতি সহজে চারণ ভূমির ঘাস এবং অন্যান্য সব উদ্ভিদকে দূষিত করে তুলতে পারে। ফলে এটি গাভীর দেহে এবং এর দুধে চলে যায়।

মানুষের শরীরে গ্রহণ করলে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরোয়েড গ্রন্থিতে গিয়ে জমা হয়। থাইরোয়েড গ্রন্থির তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি সারা শারীরবৃত্তের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব রাখে, বিশেষ করে বাচ্চাদের দেহে। তেজস্ক্রিয় দূষণের আওতায় এসেছে এমন দুধ সম্পর্কে মানুষ যে এই আশঙ্কিত তার যথেষ্টে কারণ রয়েছে বৈ-কি।

পারমাণবিক চুল্লি থেকে এর জ্বালানি ভস্ম বের করে এর প্রক্রিয়াকরণ এবং শেষ বর্জ্যগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি কাজ। বহু রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে এর জন্য। ভাল মত আবৃত মাটির গভীরে প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকালের জন্য সমাধিস্থ করা তার মধ্যে একটি। সব দেশ সব ক্ষেত্রে একেবারে নিরাপদে এটি করছে বা করতে পারছে এ কথা বলা যাবে না।

# কার্বন নিয়ে সমঝোতা

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার দৈত্য ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে বিশ্বের উপর অমঙ্গলের ছায়া ফেলছে। এখনো স্পষ্টভাবে হাতে-নাতে দেখিয়ে দেয়া যাচ্ছে না ঘটনা কখন কিভাবে কতখানি ঘটবে। বিপদটা এখানেই। আর সত্যি যখন ঘটবে সবাই জানে বিপদটা আমাদের জন্যই ঘটবে সবচেয়ে বেশি। যদিও এর কারণের মধ্যে আমাদের হাত নেই বললেই চলে।

হ্যাঁ উন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানীদের এক দল আছেন যারা বলছেন এখনো এ সম্পর্কে অনেক অনিশ্চয়তা। খাঁটি করে কিছুই বলা যাচ্ছে না, কাজেই এ নিয়ে হৈ-চৈ করে লাভ কি? ব্যয়বহুল উদ্যোগের মধ্যেও যাওয়ার কি দরকার? এর জবাব নোবেল পুরস্কার বিজয়ী একজন মনীষী সুন্দর দিয়েছেন—"তবে এই যে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অর্থ ও মেধা সম্পদের একটি বিরাট অংশ যে পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণায় ব্যয়িত হচ্ছে, হয়েছে সেও কি একটি বিরাট অনিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে নয়? পাছে অন্য পরাশক্তি এসে পারমাণবিক আক্রমণ করে বসে সেই অনিশ্চিত ধারণাই তো এর পেছনে যুক্তি। কাজেই পুরো বিশ্বের ভবিষ্যৎ যেখানে হুমকির সম্মুখীন সে রকম ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট থাকবো কোন বিবেচনায়?"

হ্যাঁ অধিকাংশ সচেতন মানুষ অবশ্য চেষ্টা করারই পক্ষে, অন্তত মুখে তাঁরা তাই বলেন।

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া স্থানীয় ব্যাপার নয়, তাই এর প্রতিরোধের চেষ্টাও শুধু স্থানীয় উদ্যোগে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় নয় বলেই প্রতিরোধের ব্যয়বহুলতাটা মানতে অনেকের কষ্ট হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই প্রচেষ্টার ফলে যে বাড়তি ব্যয় ডেকে আনবে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশে, তার ফল নিকট ভবিষ্যতে স্পষ্ট হবে না এটিই অনীহার কারণ। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ক্ষতি যা হবে সেটি সব জায়গায় সমান হবে না। এর ফলে জলবায়ুর যে পরিবর্তন তাও বেশি প্রত্যক্ষ হতে কয়েক প্রজন্ম কেটে যাবে। ওজোন স্তর বিনষ্টির জন্য যে ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে, উন্নত দেশের সুখী মানুষ ওটি খুব ভাল বোঝে। কিন্তু বিশ্ব জলবায়ু বদলায় তো

বদলাক, উষ্ণতা বাড়ে তো বাড়ুক, কিছু কিছু নিচু জায়গা পানিতে ডোবে তো ডুবুক—গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জন্য ক্যানসার তো আর সৃষ্টি হচ্ছে না।

কিন্তু যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, তাঁরা জানেন শুধু বেকায়দায় থাকা দেশগুলোর জন্য নয়, শুধু বিশ্বের জন্য নয়, নিজ দেশের খাতিরেও এ জন্য তাঁদের কিছু করতে হবে, এবং তা এখনই।

শিল্পোন্নত দেশ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া কমাবার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছে ও নিতে চাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে কার্বন ট্যাক্স। ফসিল জ্বালানি দহন যেন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে না পারে সেজন্য এর উপর ট্যাক্স ধার্য করা। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও সুইডেন সে রকম কিছু ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই নিয়েছে। ইউরোপীয় গোষ্ঠী একই ধারায় পরিকল্পনা করছে যার লক্ষ্য হবে নতুন শতাব্দীতে এসেও মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ ১৯৯০-এর মাত্রায় সীমাবদ্ধ রেখে দেয়া। এ ধরনের ট্যাক্সের একটি ফলশ্রুতি হবে কয়লা ব্যবহারকে কম লাভজনক করে তোলা এবং তুলনামূলকভাবে নিউক্লিয়ার শক্তিকে অধিক আকর্ষণীয় করা। কয়লার সমর্থক শক্তিশালী দল এবং নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী গোষ্ঠী এদিক থেকে কার্বন ট্যাক্সকে ভাল চোখে দেখছে না। তবে পরিবেশের সপক্ষে অনেকেই মনে করেন যে শেষ অবধি এরকম ট্যাক্স দেশের অর্থনীতির জন্যও অনুভূত হবে। এতে করে এমন কাজকেই নিরুৎসাহিত করা হবে যার জন্য শেষ পর্যন্ত পরিবেশ অবক্ষয় হিসাবে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়।

নিজ দেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সীমিত রাখার ব্যবস্থা করলেই শিল্পোন্নত দেশের করণীয় সব কিছু করা হয়ে যাবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর কথাও তাদেরকে ভাবতে হবে। উন্নয়নের প্রয়োজনে সেখানে ভবিষ্যতের জন্য ফসিল জ্বালানি সীমাবদ্ধ করা কঠিন হবে—যদি না সেজন্য তাদেরকে সহায়তা না করা হয়। এখানে প্রযুক্তির জ্বালানি দক্ষতা কম, দক্ষতা বাড়ানো সঙ্গতিও সেখানে কম। এও এক সমস্যা। ২০২০ সালের মধ্যে চীনকে এত বেশি কয়লা ব্যবহার করতে হবে যে সে একাই পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্গীরণ করবে। ভারতকে যোগ করলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৩০ ভাগে। এর কম পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী একে সীমিত করতে চাইলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সহযোগিতা দরকার এবং এ সহযোগিতা দিতে তারা যাতে সক্ষম হয় সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করাও দরকার। বিশ্ব পরিবেশ নির্ভর করবে এ নিয়ে দু পক্ষের সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তার উপর।

# থলে না নিয়েই বাজারে

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। আমরা বাজারে বেরুতাম বাজারের থলেটা হাতে নিয়ে। থলে নেবার কথা ভুলতাম না, কারণ থলেটা ছিল চটের। ও রকম নতুন আরেকটি কিনতে গেলে কয়েক টাকা লেগে যেত। ঘন ঘন কেনা হত না বলে বাড়িতে এগুলো বেশি জমতে পারতো না। তাছাড়া চট করে ছিঁড়ে যেতো না বলে আবর্জনার সঙ্গে নিত্য পরিত্যক্তও হত না। শেষ পর্যন্ত একদিন এটি পরিত্যক্ত হলেও নালায় নর্দমায় আটকে থেকে চিরকাল তার অস্থিত্ব ঘোষণা করত না। কারণ অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে যেখানে তার গতি হত সেখানে কিছু দিনের মধ্যে পচে গলে বিলীন হয়ে যেতে পারতো সহজেই।

এখন অবশ্য চিত্রটি ভিন্নতর। বাজারে যাবার সময় হলে থলে নেবার কথা মনেও আসে না। বাজারেই পাওয়া যায় দেদার থলে—সস্তা, অনেক সময় বিনে পয়সায়। এসব পলিথিনের থলে। যা কিছুই কিনি দোকানদার ধরিয়ে দিচ্ছেন আর একটি নতুন থলে—নানা আকারের রঙ বেরঙের। বাড়িতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এর বেশির ভাগ কার্যকারিতা হারায়—ছিঁড়ে দুমড়ে একাকার। তারপর কয়েকদিন ঘরের এখানে ওখানে চলে এদের গড়াগড়ি খাওয়ার উৎপাত। আবশেষে আবর্জনার সঙ্গে রাস্তার ধারে, ময়লার স্তূপে, কিংবা নর্দমায় বা এমনি কোথাও।

এ সব যেখানেই যাচ্ছে, যেই পলিথিন সেই পলিথিনই থাকছে। নাছোড়বান্দার মত কাউকেই যেন এরা জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না, ফুরোতে চায় না, বিলীন হতে চায় না। এভাবে দিনে দিনে জমতে জমতে শহরের যত্রতত্র এরা দূষণের একটি বড় উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যখন নর্দমার মুখ আটকিয়ে, পানি জমিয়ে এরা জুড়ে থাকে তখন তো কথাই নেই।

পলিথিনের ব্যাগ এসে শুধু চটের থলেকেই সরায়নি, সরিয়েছে কাগজের পোটলাকেও। আগে মুদীর দোকানে কাগজের দেদার ব্যবহার ছিল—পুরনো পত্রিকার বা ছেঁড়া খাতার কাগজ, কিংবা খয়েরী রঙের মোটা কাগজ। এখন এ সবেরও ব্যবহার কমেছে পলিথিনের সহজলভ্যতার কারণে। ঐ বিনীত ভাবটি কাগজের মধ্যেও ছিল—সে

বেশিদিন নিজেকে সোচ্চার রাখতো না। বড় ধরনের উৎপাতে পরিণত হবার আগেই কাগজ নিজকে মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

সস্তা পলিথিনের ব্যাগ এসে আমাদের কাজকে সহজ করেছে কিন্তু একই সঙ্গে দূষণের সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর কারণ পলিথিন জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয়। চট কিংবা কাগজ অবক্ষয়িত হয়ে মিশে যেতে পারে এদের উপর জীবাণুর কাজের ফলে। তাই এরা জৈব-অবক্ষয়যোগ্য। পরিবেশমনস্ক নীতির একটি লক্ষ্য হচ্ছে যত বেশি সম্ভব জৈব-অবক্ষয়যোগ্য জিনিস ব্যবহার করা।

কাচের বোতল, প্লাস্টিকের বাক্সের বদলে কার্ডবোর্ডের ধারক যত বেশি ব্যবহার করা যায় তত মঙ্গল। কারণ কাচ ভাঙা কিংবা প্লাস্টিক সহজে বিলীন হবার পাত্র নয়। ধোয়া মোছার সাবানের কথাই ধরা যাক। পানিতে সাবান গোলা থাকলে দূষণের ভয় নেই, কারণ সাবান জৈব-অবক্ষয়যোগ্য। ডিটারজেন্ট কিন্তু তা না'ও হতে পারে তাই ডিটারজেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধান হতে হয় পরিবেশের দিক থেকে।

প্রতিদিন কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি যে আবর্জনা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি থাকে তার মধ্যে? এর বিবরণ দেয়া সহজ নয়। এ সবের একটি বড় অংশই হচ্ছে টুকিটাকি আবর্জনা—কাগজ, কাঠ, ঘাসপাতা, প্লাস্টিক, রাবার, ন্যাকড়া, ধুলাবালি—কত কি! এর মধ্যে কাগজের ভাগই বেশি। অন্য দলে আছে খাবার-দাবারের বর্জ্য অংশ, রান্নাঘরের থেকে আসা সব্জির টুকরা, খোসা ইত্যাদি। আরো কিছু আছে যেগুলো না অবক্ষয়িত হয়, না পুড়িয়ে শেষ করা যায়—যেমন ধাতব দ্রব্য, কাঁচ, সিরামিক, ছাই ইত্যাদি।

আবর্জনার ফলে পরিবেশের দূষণকে কমিয়ে ফেলা যায় যদি আবর্জনায় পরিমাণ কমানো যায়। এর থেকে কিছু কিছু জিনিস পুনরাবর্তিত করার ব্যবস্থা করে এটি সম্ভব। ব্যবহারযোগ্য জিনিসের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আর্থিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। ফেলনা জিনিসকে উদ্ধার করে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও ব্যবহার করা যায় যেমন কাগজ, ন্যাকড়া বা চট থেকে কাগজ বা বোর্ড তৈরির কাজে। আমাদের নগরে এ কাজ খুব সীমিত পরিমাণে চলছে। উন্নত দেশসমূহে পরিবেশ-মনস্কতায় ফলে আজ আবর্জনার পুনরুদ্ধার ও পুনরাবর্তনের উপর অধিক মনোযোগ দেয়া হচ্ছে? ওখানে এ কাজে প্রচুর গবেষণাও চলছে।

মোটর গাড়ির টায়ারের কথাই ধরা যাক। কাজ ফুরাবার পর একেবারে ফেলে দিলে এই টায়ার দূষণের একটি উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। পুরনো টায়ারের কিছু কিছু ব্যবহারের চেষ্টা অবশ্য আমরা করি। এক সময় টায়ারের স্যান্ডেল, পাপোষ এ সব বেশ চালু ছিল। জ্বালানি হিসাবে টায়ার পোড়ার রীতি আছে। কিন্তু সেটি নিজেও আরো বড় দূষণকারী ব্যাপার। অপ্রীতিকর সালফিউরিক ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুধু বায়ু দূষিত করে না, সালফিউরিক এসিড বৃষ্টিতেও অবদান রাখে। টায়ারের দূষণ সবচেয়ে বেশি অনর্থ যেখানে ঘটায় সেই যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি এমন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে পুরনো টায়ারকে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত করে হোস পাইপ, গাসকেট এমন কি নতুন টায়ার তৈরিরও একটি সুরাহা হয়েছে।

আবর্জনার যে অংশকে লাভজনকভাবে পুনরুদ্ধার করা যাবে না, তা যত বেশি জৈব-অবক্ষয়িত হয়ে বিলীন হয়ে যায় তত ভাল। এতে যে শুধু পরিবেশের দূষণ কমবে তা নয়, জমির সার বৃদ্ধি, বায়োগ্যাস উৎপাদন ইত্যাদির আয়োজনও এর মাধ্যমে করা যেতে পারে।

রিসাইক্লিং অর্থাৎ ব্যবহৃত জিনিসের পুনরাবৃত্ত ব্যবহার নিয়ে সারা দুনিয়া জুড়ে কাজ চলছে, প্রধানত পরিবেশ রক্ষার তাগিদে। এর জন্য সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন গবেষণা, নতুন নতুন শিল্প যেখান থেকে আমাদের গ্রহণীয় অনেক কিছু রয়েছে।

হাঁস-মুরগির বিষ্ঠাকে সার হিসেবে ব্যবহার আমাদের দেশে নতুন কোন ঘটনা নয়। কিন্তু একে প্রক্রিয়াজাত করে দক্ষ নাইট্রোজেন সারে পরিণত করার খবর নিশ্চয়ই নতুন। একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভিত্তিতে মুরগির খামারের এই নিত্যবর্জ্যকে 'আকুয়া নিউর' নামক সারে রূপান্তরিত করে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মুরগির বিষ্ঠা শুধু ব্যবহার করা নয়, একে বিক্রি করাও সম্ভব হবে।

কয়লা নানাভাবে ব্যবহার করতে হয় আমাদের। খনিজ কয়লা নেই বলে কাঠ পুড়িয়ে কাঠ কয়লা করেও কাজ চলে। কিন্তু সেটা করতে গেলে বনাঞ্চলের উপর চাপ পড়ে। একটি গাছও না কেটে শুধু মাত্র পরিত্যক্ত জৈব-সামগ্রী থেকে কাঠ কয়লা তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে থাইল্যান্ডে। শুধু তাই নয়, ঐ কাঠ কয়লা শিল্প কারখানায় নিয়মিত উৎপাদিত হয়ে আসছে ১৯৮২ সাল থেকে, সার অধিকাংশ রপ্তানি হচ্ছে— কোরিয়া, হংকং এবং তাইওয়ানে। পরিত্যক্ত খড় থেকে বহু রকমের দ্রব্য তৈরি হতে পারে সে কথা শুনছি এই প্রথম। ডেনমার্কের বায়োটেকোলজী ইনস্টিটিউট এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যার মাধ্যমে পরিত্যক্ত খড় থেকে জাইলিটোল নামক মিষ্টিকারক বস্তু উৎপাদন সম্ভব হবে। প্রাথমিক প্রচেষ্টায় দেখা গেছে যে, প্রতি মেট্রিক টন খড় থেকে ৯০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত মিষ্টিকারক তৈরি সম্ভব যা সাধারণ চিনির সমান মিষ্টি। এটি চুইংগাম, টফী, কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। একই প্রক্রিয়ায় এই পরিমাণ খড় থেকে উপজাত হিসাবে পাওয়া যাবে ৯০ কিলোগ্রাম ঝোলা গুড় এবং ২০ কিলোগ্রাম প্লাস্টার অব প্যারিস।

আবর্জনা এবং কাদা একসঙ্গে মিশিয়ে আগুনে পুড়লে কি তৈরি হয়? অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এতে তৈরি হয় এমন এক রকম হালকা কাচ সদৃশ নুড়ি যেগুলো নির্মাণ কাজের জন্য কংক্রীটে ব্যবহার করা যাবে চমৎকারভাবে। এ কংক্রীট হবে সাধারণ কংক্রীটের চেয়ে হালকা—বাড়ি তৈরিতে খুবই উপযোগী। অথচ একই সঙ্গে আবর্জনা সামলাবার কাজটিও সহজ হয়ে যাবে, পরিবেশে কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে।

মাছের মাথা, কাটা, পাখনা, আঁইশ, নাড়ি-ভুঁড়ি সব পরিত্যক্ত অংশ ব্যবহার করে বাজারজাত করার মত পশুখাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি। এর ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে ফিশ মিউরেটর নামক যন্ত্র। এতে ঘণ্টায় সাত টন পর্যন্ত মাছের পরিত্যক্ত অংশ এভাবে ব্যবহৃত হয়ে যেতে পারে। মাছ ধরার বড় বড় ট্রলারের সঙ্গেও যন্ত্রটি জুড়ে দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। তাহলে বাড়িতে বা কারখানায় আসার আগেই মাছের এসব অংশের একটি গতি হয়ে যাবে।

তাপ নিরোধী, আগুন নিরোধী গুণের জন্য এসবেসটস জিনিসটা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এসবেসটস গুঁড়া বা বাষ্প শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারখানায় এ সামগ্রী তৈরি হবার পর যে গুঁড়া বা পরিত্যক্ত অংশ থাকে তাকে নিরাপদ উপায়ে দূর করা বেশ বড় একটি সমস্যা। কিন্তু এখন এই বর্জ্যের জন্যও একটি উপযুক্ত ব্যবহার উদ্ভাবিত হয়েছে। পরিত্যক্ত কাচ এবং এসবেসটস এক সঙ্গে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করালে উভয়ে গলে একটি নতুন দ্রব্য তৈরি হয়। এতে এসবেসটস একেবারে নিরাপদ জিনিসে পরিণত হয় এবং নতুন দ্রব্যটিকে কাচের মত ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এটি ভেঙে গেলে বা গলে গেলে ক্ষতিকারক হবে এমন সম্ভাবনাও নেই, কারণ ইতোমধ্যে এসবেটস বদলে গিয়ে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে।

পরিত্যক্ত জিনিস লাভজনকভাবে ব্যবহারের এ সব পদ্ধতি বিদেশে উদ্ভাবিত বটে, তবে আমাদের দেশেও একেবারে কিছু হচ্ছে না তা নয়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বি. সি. এস. আই. আর. এর বিজ্ঞানীরা ইস্পাত শিল্পের বর্জ্য স্লাগ বা গাদ ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে সিমেন্ট তৈরির একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। এখন সিমেন্ট তৈরির জন্য দেশে প্রচুর ক্লিংকার আমদানি করতে হয়। ইস্পাত কারখানার পরিত্যক্ত স্ল্যাগ ক্লিংকারের সঙ্গে মেশালে কম ক্লিংকার খরচ করেই এই নতুন পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরি সম্ভব। চট্টগ্রাম ক্লিংকার চূর্ণ করার কারখানাতে প্রাথমিক উৎপাদনে ইতোমধ্যেই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আপাতত স্টিল মিল থেকে ১২ থেকে ১৫ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণ যে স্লাগ পাওয়া যাবে তা ব্যবহার করে বছরে দেড় কোটি টাকার ক্লিংকার আমদানি কমানো সম্ভব হবে।

# শিশি বোতল পুরনো কাগজ

আমাদের নগর জীবনে একটি ভাল অভ্যাস বহুদিন থেকে চালু রয়েছে। এটি হলো ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা জমিয়ে বিক্রি করে দেয়া। এভাবে পুরনো কাগজ খাতাপত্র, টিনের প্লাস্টিকের কৌটা, বোতল ইত্যাদি গিন্নীরা সযত্নে জমিয়ে রাখেন। ফেরীওয়ালারা বাড়ি বাড়ি আসেন এগুলো অল্প দামে কিনে নিয়ে যেতে। তারা এগুলো পৌঁছিয়ে দেন নতুন উৎপাদনকারীদের কাছে। এভাবে কাগজ চলে যায় ঠোঙ্গা হতে কিংবা আবার মণ্ড হতে, বোতল বা টিন চলে যায় নতুন লেবেল লাগিয়ে আবার ব্যবহৃত হতে, এমন কি পশু হাঁড় চলে যায় বোতাম তৈরির কারখানায়। এতে সব পক্ষই উপকৃত হচ্ছে।

এই যে কাজটি আমরা করছি তাতে যে সবার কিছু আর্থিক উপকার হচ্ছে শুধু তাই নয়। পরিবেশ সংরক্ষণের দিক থেকে এর একটি বড় অবদান রয়েছে। এটি যদি আরো সুশৃঙ্খল ও দক্ষভাবে করতে পারি তাহলে আর্থিক ও পরিবেশগত উভয় দিকে উপকার আমরা অনেক বাড়াতে পারবো। উন্নত দেশগুলো আগে এ দিকটির প্রতি মনোযোগ দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। বরং ক্রমাগত নতুন নতুন জিনিস বানিয়ে কাজ ফুরালে ফেলে দেয়াই ছিল নিয়ম। কিন্তু আজ প্রধানত পরিবেশ. রক্ষার একটি বড় প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে হারে পরিত্যক্ত জিনিসের আবর্জনা পড়েছিল তাতে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। নগর জীবনে দৈনন্দিন সৃষ্ট এই বিপুল পরিমাণ আবর্জনাকে সরিয়ে একটি গতি করা সে এক বিরাট কাজ। সেটি ঠিক মত না করতে পারলে পরিবেশ বিপন্ন হয়। তা ছাড়া এর অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকও রয়েছে। ব্যবহৃত কাগজকে আবার কাগজের কারখানায় পাঠিয়ে নতুন কাগজ তৈরিতে কাজে লাগালে ঐ পরিমাণ কাঁচামাল আর দরকার হয় না। রক্ষা পেয়ে যায় পরিবেশের অনেক গাছ কিংবা বাঁশ, রক্ষিত হয় বনাঞ্চল। তার উপর বাঁশ বা গাছকে কাগজে পরিণত করতে যে শক্তি ব্যয় করতে হত ঐ পুরনো কাগজ থেকে নতুন কাগজ বানাতে লাগবে তার চেয়ে অনেক কম। ঐ শক্তি উৎপাদন করতে গিয়েই তো আমরা বায়ু দূষণ করি সবচেয়ে বেশি। খরচও বাঁচল, পরিবেশও রক্ষা পেলো। একই কথা ধাতু, কাঠ,প্লাস্টিক, কাচ সবকিছুর পুনরায় ব্যবহার সম্বন্ধেই খাটে।

অর্থিকভাবে মানুষের অবস্থা যতই ভাল হয়, ততই তার ভোগ্য পণ্য এবং সেই সঙ্গে তার পরিত্যক্ত অংশের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। উন্নত বিশ্বের একটি পরিবারে প্রতিদিন যে পরিমাণ আবর্জনা জমে তার আয়তনের অর্ধেক এবং ওজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো শুধু আবরণ, মোড়ক, কৌটা ইত্যাদি। এর আবার অর্ধেক হলো কাগজ এবং অন্য অর্ধেক কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি মিলে। এ সব দেশের প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি বছর পরিত্যক্ত গড়পড়তা প্যাকেজিং সামগ্রীর ওজন দাঁড়াতে পারে ৩০০ কিলোগ্রামের মত। এমন দেশও আছে যেখানে এসব প্যাকেজিং সামগ্রী তৈরিতেই দেশের বাজেটের তিন শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। এ ধরনের সামগ্রীর মধ্যে বেশ কিছু ফোম রয়েছে এবং নানা রকম স্প্রে করার এরোসল রয়েছে যাতে সি. এফ. সি. গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই গ্যাস শেষ পর্যন্ত ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে ওজোন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষতি ঘটায়।

এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পর পুনরাবৃত্ত ব্যবহার সম্পর্কে নতুন নতুন গবেষণা, শিল্প কারখানা এবং সামাজিক উদ্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে। জ্বালানি এবং কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধিও এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ যোগাচ্ছে। আমাদের দেশে এর অভ্যাস পুরনো হলেও, নগরজীবনে পরিত্যক্ত জিনিসের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে এদের দক্ষ ব্যাপারের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন তেমন হচ্ছে না।

পুনরাবৃত্ত ব্যবহারের জন্য ভাল পদ্ধতি হলো ব্যবহারকারী নিজেই বিভিন্ন ধরনের জিনিস আলাদা করে রেখে দেয়া এবং সেগুলো কিছুদিন পর ঐ আলাদাভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা। আমরা যদি সবকিছু এক করে ডাস্টবিনে ফেলি তাহলে সেখান থেকে দরকারী জিনিস উদ্ধার করে কাজে লাগানো দক্ষভাবে সম্ভবও নয়, রুচিসম্মতও নয়। এর পর জিনিসগুলো যেন উপযুক্ত শিল্পে যেতে পারে এবং সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে সে জন্য সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে যে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে তার সুযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা যেমন জরুরী তেমনি সামগ্রী উৎপাদনে এবং আমদানিতে ব্যয়সংকোচও অনুরূপভাবে জরুরী। উদাহরণস্বরূপ কাগজ শিল্পের কথাই ধরা যাক। বাড়িতে এবং অফিসে আদালতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যবহৃত কাগজ পরিত্যক্ত হয়, ব্যবহারের দক্ষ উপায়ের অভাবে এর অধিকাংশই পুড়ে ফেলতে হয়, অথবা নিছক পরিবেশ বিনষ্টিতে চলে যায়। ব্যবহৃত কাগজ থেকে তৈরি কাগজ উন্নত মানের হয় না বলে তা দিয়ে নিকৃষ্টতর কাজই বেশি হয়েছে এ পর্যন্ত। অথবা বড় জোর সাধারণ মণ্ডের সঙ্গে এর খানিকটা মিশেল দেয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ডেনমার্কে এমন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে যার ভিত্তিতে নতুন কারখানায় বছরে ৩০ হাজার মেট্রিক টন কাগজ তৈরি হয় শুধু পরিত্যক্ত কাগজ ব্যবহার করে। এ কাগজ লেখা এবং মুদ্রণ উভয় কাজের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার করা যাবে। অথচ এই ৩০ হাজার টন কাগজের জন্য একদিকে যেমন নতুন করে বনাঞ্চল নষ্ট করতে হবে না, অন্য দিকে ঐ বিপুল ওজনের আবর্জনার একটি সুন্দর হিল্লেও হয়ে গেল।

# জঞ্জালের শেষ গতি

নগর জীবনে মানুষের যেমন ঘনবসতি, তেমনি মানুষের সৃষ্ট জঞ্জালেরও এখানে ঘন অবস্থান। এ জঞ্জাল ঠিক সময়ে সুন্দরভাবে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা না হলে নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। ডাস্টবিন তাই নগর সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোন নগরের নাগরিকতা কতখানি এগিয়ে আছে তা বোধ হয় এর ডাস্টবিনের চেহারা থেকেও খানিকটা অনুধাবন করা যায়। আমাদের রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে ময়লা ফেলার যে ব্যবস্থা আছে তাকে আদর্শ ব্যবস্থা বলা যায় না—খোলামেলা পাকা একটু ঘের দেয়া জায়গা, কিংবা ঢাকনাবিহীন একটি বড় ধাতব আধার। কিন্তু তাও কি আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করি? সুনির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলতে আমরা কেন যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি না, ফেলতে গিয়েও আধারের ঠিক ভেতরে না ফেলে আশপাশে সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েই ফেলি। তারপর নানা হস্তক্ষেপে এটি যায় আরো ছড়িয়ে। এর সবকিছু কিন্তু নগরীর তাৎক্ষণিক পরিবেশে সুস্পষ্ট অবনতি ঘটিয়ে চক্ষু-নাসিকার অনুভূতিকে তো বটেই স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে দারুণ কষ্ট দেয়।

নাগরিক জীবনের উন্নয়নের অপর প্রান্তে জঞ্জাল সংগ্রহ ব্যবস্থা আজ এক শিল্পিত উদ্যোগে পরিণত হতে চলেছে। সুদৃশ্য চিত্রিত আধার রাস্তার পাশে রয়েছে যাকে দেখলে বা যার কাছে গেলে এর সঙ্গে ময়লার কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করা দুষ্কর হয়। অথচ ছিদ্র পথে সবাই বাড়ির সব জঞ্জালকে এর মধ্যেই সোপর্দ করে থাকে। এ সব যখন ময়লার গাড়িতে সংগৃহীত হয় সে প্রক্রিয়াটিও এতই রাখা ঢাকাভাবে সম্পন্ন হয়, যে, সেখানেও কারো কাছে কিছু দৃশ্যমান হয় না।

এ সব অবশ্য উন্নত সব নগরীর কথা। আমাদের নগরীতে এত সংস্কৃতভাবে না হলেও অন্তত একটি কার্যকর ব্যবস্থা যদি মোটামুটি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চালু থাকে তাহলেও আমরা খুশি হবে।

যে কথাটি উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব নগরীর জন্য আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো এভাবে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ জঞ্জলের শেষ গতিটি কি হবে। অনেক জায়গাতেই সাধারণত যা করা হয় তাহলে কোন সুনির্দিষ্ট নিচু জায়গায় এগুলো ফেলে ফেলে তা ক্রমে ক্রমে ভরাট করে তোলা হয়। এভাবে যেখানে জমি ভরাটের কাজে

জঞ্জালে ব্যবহৃত হয় তার আশপাশের পরিবেশ খুব একটা সুখপ্রদ হয় , তাই স্থনীয় লোকজন এটি মোটেই পছন্দ করেন না সঙ্গত কারণেই।

যেভাবেই যা করা হোক না কেন একটি কথা কিন্তু মনে রাখতে হয়—অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উভয় কারণের দিক থেকেই। এটি হলো বসত বাড়ি থেকে সংগৃহীত জঞ্জালের জ্বালানি-গুণ কয়লার এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে পারে। কাজেই শুধু জমি ভরাটের উপকরণ হিসেবে একে আমরা দেখলে চলবে না। এক সময় জঞ্জালকে সরাসরি পুড়ে ফেলার রীতি প্রচলিত ছিল—দাহ্যগুণ যথেষ্ট বলেই এটি সম্ভব। কিন্তু এভাবে যেনতেন প্রকারে পুড়ে ফেললে না আমরা ব্যবহার করতে পারি এর জ্বালানি গুণ, না শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারি পরিবেশ দূষণকে। জঞ্জালের মধ্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে যা পুড়লে নানা বিষাক্ত গ্যাস গিয়ে বাতাসে মিশতে পারে। আর কার্বন ডাই-অক্সাইড তো রয়েছেই।

বিকল্প আর একটি প্রক্রিয়া ইদানিং বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জমি ভরাট করার কাজে যে জঞ্জাল খুব ব্যবহৃত হয়, তার প্রাকৃতিক অবক্ষয় থেকেই আবার ব্যবহার যোগ্য জ্বালানি উদ্ধার করা সম্ভব। জঞ্জালে সাধারণত পচন যোগ্য প্রচুর জিনিস থাকে। তরকারীর খোসার মত বহু জিনিস তো সংগৃহীত হবার আগে থেকেই পচতে আরম্ভ করে। জমি ভরাটে ফেলার পর ওখানকার মাটি ও পানির নানা জীবাণুর ক্রিয়ায় অবক্ষয়ক্রিয়া দ্রুততর হয়। এতে এর মধ্যে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে যায় বলে সেখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। এর পর যে বিক্রিয়া ঘটে তাতে মিথেন সমৃদ্ধ গ্যাস এই জঞ্জালের এনেরোবিক অবক্ষয় থেকে গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস আমাদের পরিচিত বায়োগ্যাস থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে এটি জমি ভরাট গ্যাস নামেই অধিক পরিচিত।

যদি জঞ্জাল থেকে সর্বাধিক জ্বালানি শক্তি ব্যবহারই উদ্দেশ্য হয় তাহলে একে পুড়িয়ে তা নেবার চেষ্টা করাই লাভজনক। কারণ জঞ্জালের প্রায় সবটুকুই পুড়ে গিয়ে এতে অবদান রাখে। কিন্তু জমি ভরাটের জঞ্জালে এমন অনেক জিনিস থাকে যা জ্বালানি গ্যাস তৈরিতে অবদান রাখতে পার না—যেমন প্লাস্টিকের বোতল, যা জ্বলবে কিন্তু পচবে না। আবার অবক্ষয়যোগ্য অংশের শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশি পূর্ণ অবক্ষয়িত হতে ১৫ বছরেরও বেশি লেগে যায়। কাজেই ব্যাপারটি ধীর এবং অদক্ষ—তবে অবশ্যই পরিবেশের দিক থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য।

জমি ভরাটের গ্যাস কি উপায়ে উদ্ধার করা হয়? সাধারণত এখানে জঞ্জালের মধ্যে কয়েক মিটার গভীরে সছিদ্র নল নামিয়ে দিয়ে পাম্প করে জ্বালানি গ্যাস নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস বা বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হতে পারে এ রকম সব কাজেই এই জমি ভরাট গ্যাসও উপযোগী। চুল্লি, ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্র সবকিছুতে এককভাবে বা সহায়ক হিসাবে এই গ্যাস ব্যবহার করা চলে। ব্রিটেন, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশে দশ পনরো বছর যাবত এ রকম গ্যাস উদ্ধার ও ব্যবহারের নানা প্রকল্প চালু রয়েছে। আমাদের দেশে যেখানে পরিবেশ দূষণ ও জ্বালানি সংকট উভয়েই প্রকট, আর

আমাদের নগরী যেখানে নিচু জায়গা ভরাট করার প্রয়োজনীয়তাটাও কম নয় সেখানে জঞ্জাল ব্যবহারের এই নবদিগন্তকে স্বাগতম জানানো উচিত।

জঞ্জালকে এভাবে জমি ভরাট ও অবক্ষয়ের কাজে সোপর্দ করার আগে অবশ্য এর আরো নগদ প্রাপ্তির অংশগুলো উদ্ধার করে নেয়া উচিত। তা হলো পুনরাবর্তিত করার জন্য কাগজ, ধাতব অংশ, কাচ ইত্যাদি আগেভাগেই বাছাই করে নেয়া। দারিদ্রের তাড়নায় আমাদের মধ্যে অনেক হতভাগ্য যে প্রক্রিয়ায় এগুলো ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করে সেটি বেদনাদায়ক। তবে সব দিক থেকেই এই উদ্ধারের কাজটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি সঠিক এবং দক্ষভাবে হওয়া উচিত। উদ্ধারকৃত অংশগুলো যাতে যথাযথ কারখানায় গিয়ে আবার ব্যবহারে আসতে পারে সেটি একটি সার্বিক পরিবেশ ও শিল্প পরিকল্পনার বিষয়। একটি জাতীয় অভ্যাস সৃষ্টির বিষয়ও বটে। এটি না করতে পারলে আর্থিক অপচয় হয়তো বটেই দিন দিন জঞ্জালের বহর বেড়ে পরিবেশ রক্ষাও অসম্ভব হয়ে উঠে।

# মাটিতেই যেন মিশে যায়

বাজার করার প্লাস্টিক ব্যাগ পরিবেশের বন্ধু নয়। নানা রকম দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রীর সুন্দর প্লাস্টিকের মোড়কও তা নয়। অথচ আজকাল এগুলোরই দিন। আমরা তো টের পাচ্ছিই সারা দুনিয়ার লোক টের পাচ্ছে—রোজ রোজ এতসব প্লাস্টিক ব্যাগ আর মোড়ক জমে জমে পরিবেশের দুর্গতি কিভাবে বাড়ছে। এদের দোষ এরা জৈবভাবে অবক্ষয়িত হবার নয়, যেমনটি অবক্ষয়িত হয় সেই পুরনো চটের থলে কিংবা কাগজের ঠোংগা। এর প্রতিকার হতে পারত চটের থলেকে বা কাগজের ঠোংগাকে আবার ফেরত এনে। আমাদের জন্য সেটিই হত ভাল—অন্তত দেশে-বিদেশে পাঠের চাহিদা বাড়ত। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রতিকারটা আসবে অন্যদিক থেকে। প্লাস্টিক ব্যাগ একবার মানুষ হাতে নিয়েছে, এটা আর ছাড়তে চাইছে না। এখন থেকেই গড়ে নিতে হবে পরিবেশ রক্ষার উপর অধিক ব্যয় পোষায়। কিন্তু তা দিয়ে বাজারের ব্যাগ তৈরি করতে গেলে খরচে পোষাবে না।

সাম্প্রতিক গবেষণা আলুর খোসা এবং পনির তৈরির বর্জ্যকে ব্যবহার করে খুব সস্তায় এই ল্যাকটিক এসিড তৈরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আলুর খোসার মত একটি জিনিস যা বাড়ি বাড়ি এবং খাদ্য শিল্পে প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়ে পরিবেশের দূষণের ভার বাড়ায় তাকে এমন চমৎকার কাজে ব্যবহার করে পরিণামে আবার মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারা সেটিও পরিবেশ সংরক্ষণের দিক থেকে বড় লাভ। এভাবে উৎপন্ন ল্যাকটিক এসিড সহযোগে যেই সস্তা অবক্ষয়শীল প্লাস্টিক পাওয়া যাবে তার বহুতরো ব্যবহার সম্ভব হতে পারে। পরিবেশের দিক থেকে এর সবই হবে বন্ধুসুলভ।

বর্তমান দশকটি যখন শেষ হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে শেষ হবে বর্তমান শতাব্দীটিও। আগামী শতাব্দীকে যেন একটি সর্বাঙ্গীন সুস্থ পরিবেশের মধ্যে আবাহন করা যায় বহু সচেতন জাতির মধ্যে এখন সেই চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছে। এই চেষ্টায় পরিবেশ উন্নয়নের কোন পদক্ষেপই তুচ্ছ নয়। ইতালি যে এই দশকের পর আর একটি প্লাস্টিকের টুকরাকেও পরিত্যক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন পরিবেশ নষ্ট করতে দিতে অনিচ্ছুক সেটি এই সংকল্পেরই একটি অংশ। জাপান সরকারের পরিবেশ কর্তৃপক্ষ আগামী শতাব্দীর শুরু থেকে জাপানকে 'ইকোপোলিস' অর্থ 'সুপরিবেশ জনপদে' পরিণত করার ঘোষণা

দিয়েছে। ঐ মুহূর্তে সেখানে পরিবেশ নিয়ে অনেক অসন্তোষ—বায়ু দূষণ বেড়েছে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে এসবেসটস দূষণ, অর্গানিক দ্রাবকের মাধ্যমে পানি দূষণ ইত্যাদি নতুন উপসর্গ। জাপানের বৃহৎ ইলেকট্রনিক্স শিল্প থেকে সি. এফ. সির ব্যবহার দূর করাও একটি বিরাট কাজ। শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে আমাদের জন্যও। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে নিজেদের জন্য এবং ভবিষ্যতে বংশধরদের জন্য সুস্থ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টির অনেক মূল্যবান সময় ও সুযোগ। এখানে আমরা আমাদের কর্তব্য কিভাবে নির্ধারণ করবো? আমরা কি গা ভাসিয়ে দিয়ে চোখের সামনে অবক্ষয়িত হতে উপযোগী করে। চারদিকে জোর গবেষণা চলছে প্লাস্টিককে কিভাবে বায়োডিগ্রেডেবল্ অর্থাৎ জৈব অবক্ষয়শীল করে তোলা যায়; যাতে করে ব্যবহারের পর এটি নিজেই ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

এ গবেষণার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ সচেতন বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ ও তাদের তাদের সরকারের তরফ থেকে। যেমন ইতালি সরকার গত বছর একটি আইন প্রণয়ন করেছে যে বর্তমান দশকের মধ্যে অবক্ষয় অযোগ্য সমস্ত প্লাস্টিক ব্যাগ ও মোড়কের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে উঠিয়ে দিতে হবে। সুইডেন ইতোমধ্যেই প্যাকেজিং-এর কাজে অবক্ষয় অযোগ্য পলিভিনাইল ক্লোরাইড প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কাজেই এদিক থেকে আর একটি সার্থক সবুজ শিল্প গড়ে উঠার হাতছানি বাজারের দিক থেকে এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

চটের মত মাটিতে মিশে যাবে এমন প্লাস্টিক উদ্ভাবনের খবর এসেছে ইতালি থেকেই। পলিথিনজাতীয় যেসব প্লাস্টিক এখন আমরা ব্যাগে বা মোড়কে ব্যবহার করছি সেগুলোর অণু দীর্ঘ শৃঙ্খলে তৈরি। এরা পানিকে বিকর্ষিত করে এবং মাটিতে যেসব পচন সৃষ্টিকারী জীবাণু রয়েছে সেগুলো একে আক্রমণ করে সুবিধা করতে পারে না। ইতালিতে উদ্ভাবিত নতুন প্লাস্টিকের অণুগুলো সোজা এবং বেঁটে। জীবাণু এর একটি গতি করতে পারে। তাছাড়া এর সঙ্গে মিশেল দিয়ে দেয়া হয় প্রচুর পরিমাণে শর্করা—অনেকটা ময়দার মত জিনিস। মাটিতে পড়ে থাকলে এই অংশ সহজেই ক্ষয়ে গিয়ে আঁশগুলো আলাদা হয়ে পড়ে, জীবাণুর কাজ সহজ হয়।

জৈব অবক্ষয়শীল প্লাস্টিক তৈরির আরো খবর আছে যা পরিবেশের দিক থেকে খুবই যথাযথ হবে। অস্ত্রোপচার করার সময় সার্জন যে সুতা ব্যবহার করেন তাকেও জৈব অবক্ষয়শীল হতে হয়। ক্ষত জোড়া লেগে যাবার পর এই সুতা আপনিই অবক্ষয়িত হয়ে মাংসপেশীর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু এ সুতা তৈরি করতে যে ল্যাকটিক এসিড ব্যবহার করতে হয় সেটি ব্যয় সাপেক্ষ জিনিস। অস্ত্রোপচারের সুতা একটি বিরল এবং বিশেষ ব্যবহার্য সামগ্রী বলে এই ক্ষেত্রে, দেব আমাদের শহর গ্রামের পরিবেশকে, নাকি সবার মত আমরাও সচেতন হবো, সচেষ্ট হবো। এটি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের এবং সমস্ত জাতির সচেতন সিদ্ধান্তের বিষয়।

# কার দোষ কতখানি

প্লাস্টিক ও ধাতব দ্রব্য আমাদের নাগরিক বর্জ্যের একটি বড় অংশ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এরা বেশ গুরুত্ব পায়। আর যে দুটি বস্তু বর্জ্য হয়ে পরিবেশকে খুব ভারাক্রান্ত করে তারা হলো কাগজ এবং কাচ। কাগজের উদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কথাবার্তা বলা হলেও শেষ অবধি এর সমস্যাগুলা অতিক্রম করতে হলে বড় আকারের সরকারি সমর্থন প্রয়োজন হয়। জার্মানি ও সুইডেনে এ সম্পর্কে নীতি হলো যে পুনর্ব্যবহারে কাগজ সরকারি অফিসে ব্যবহারের জন্য কিনে নেয়া হয়। আবর্জনা থেকে পুনরুদ্ধারের ফলে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যয়ে যে সাশ্রয় হয় সেটি কাগজের পুনর্ব্যবহার শিল্পে ভর্তুকি দিতে দক্ষভাবে কাগজকে কালিমুক্ত করা। সম্প্রতি এ বিষয়ে উন্নতি হয়েছে, এতে কালিকে ধুয়ে পুরনো কাগজ থেকে ছাড়িয়ে যেমন দেখা যায় তেমনি একই সঙ্গে এক রকম কাদার সঙ্গে এ কালিকে মিশিয়ে নির্দোষ বস্তুতে পরিণত করা হয় যা সহজে জমি ভরাটে ফেলে দেয়া যায়। নইলে বিষাক্ত সীসাযুক্ত ছাপার কালি নিষ্কাশন আর এক পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করতে পারে।

কাচের ক্ষেত্রে কাচকে গলিয়ে নতুনভাবে ব্যবহারের অর্থনৈতিক আকর্ষণ কম। বোতল অবিকৃত রেখে পুনর্ব্যবহার অবশ্য ভিন্ন কথা। কাচের কাঁচামালের দাম বেশি নয়, এরা সহজলভ্য। বলতে গেলে কাচের প্রধান কাঁচামাল বালি, চুনাপাথর ও লবণ প্রায় অফুরন্ত। পুরনো কাচ গলিয়ে নতুন কাচ করতে জ্বালানি খরচ কিছু কম লাগে বটে, তবে সেটি তেমন বড় কিছু নয়। কাচের ফলে সৃষ্ট দূষণ কমাবার একটিই বাস্তব উপায় আপাতত রয়েছে সেটি হলো ব্যবহৃত কাচের বোতল বা কৌটাগুলো বার বার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। ইউরোপীয় গোষ্ঠী বিধি প্রণয়ন করছে যাতে ১৯৯৭ সালের মধ্যে কাচসহ সকল পানীয় বোতলের শতকরা সত্তর ভাগ পুনর্ব্যবহার করতে হবে।

গার্হস্থ্য বর্জ্য সৃষ্টি, বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয় আজ বিশ্ব জোড়া গুরুত্ব পাচ্ছে পরিবেশ সচেতনতার কারণে। নানা দিক থেকে বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ের উপর কাজ করছেন। মজার ব্যাপার হলো এর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদরাও আছেন। তাঁরা পুরাতন ইমারত বা সভ্যতর অন্য কোন স্মৃতিচিহ্ন খননের কাজ করেন না, বরং তাঁদের গবেষণাস্থল হলো আবর্জনা ফেলার স্থান। এ প্রত্নতত্ত্ববিদরা কেমিস্ট ও মাইক্রোবায়োলজিস্টদের সঙ্গে মিলে

দল বেঁধে কাজ করেন। বছরের পর বছর ধরে নাগরিক আবর্জনা যেখানে জমছে সেখানে তাঁরা খনন করেন। এক এক স্তর কখনকার অর্থাৎ এই প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে কোন্ যুগে তা নির্ণিত হয় এই স্তরের গভীরতা থেকে। তাছাড়া বর্জ্যগুলো ডিজাইন থেকেও বোঝা যায়। ফ্যাশান তো বছর বছর পরিবর্তন হয়েই চলেছে। কৌটার উপর উৎপাদন তারিখ থাকে—তাছাড়া অবিকৃত খবর কাগজও মিলে যায় এর মধ্যে। তাহলে তো কথাই নেই। আবর্জনা স্তূপ থেকে ৫০ বছরের পুরনো পত্রিকা পাঠযোগ্য অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে এটি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আবর্জনা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ এ সম্পর্কে কিছু প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্নও তুলেছেন। যেসব আবর্জনা মাটি ভরাটে ব্যবহার করা হয় সেখানে প্লাস্টিকের দোষকে বড় করে দেখার এবং কাগজেরটি ছোট করে দেখার তাঁরা পক্ষপাতী নন। প্লাস্টিক বোতলের চল বাড়া সত্ত্বেও জমি ভরাটের আবর্জনার এর অবদান ওজনে শতকরা ৫ ভাগ এবং আয়তনে শতকরা ১২ ভাগের বেশি নয়। অপরপক্ষে এর মধ্যে কাগজের পরিমাণটি বিপুল ওজনেই হোক বা আয়তনেই হোক কোনভাবে শতকরা ৪০-৫০ ভাগের কম নয়। শুধু খবরের কাগজেই এর একটি বড় অংশ। কাগজ যদিও জৈব অবক্ষয়যোগ্য জিনিস হিসাবে পরিচিত তবুও আবর্জনা প্রত্নতাত্ত্বিকরা দেখেছেন বছরের পর বছর এগুলো প্রায় অবিকৃতভাবে আদি ওজন ও আয়তনে আবর্জনা স্তূপের মধ্যে রয়ে গেছে।

আবর্জনায় বিভিন্ন বস্তুর তুলনামূলক দায়িত্ব যাই হোক স্পষ্টত এর গুরুভার লাঘবের একটিই উপায় আছে তা হলো আবর্জনা হিসাবে শেষ গতি হবার আগে পুনর্ব্যবহারের জন্য তাকে উদ্ধার করা। এই উদ্ধার করার ব্যাপারে দেশে দেশে প্রচুর সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে। প্রায়ই দেখা যায় স্থানীয় উৎসাহীদের উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফেলনা জিনিসগুলোকে সুন্দরভাবে আলাদা আলাদা বাক্সের মধ্যে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে—কোনটাতে শুধু কাগজ, কোনটাতে ধাতব জিনিস, কোনটাতে কাচ ইত্যাদি। সাধারণ নাগরিকরাও এ ব্যবস্থায় সাড়া দিতে উৎসাহী। কিন্তু প্রযুক্তি ও উৎপাদনকারী শিল্প এখনো পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধারকৃত বস্তুগুলো পুনর্ব্যবহারে আনতে পারছে না বলে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না। আমাদের নাগরিক জীবনে অবশ্য এখনো এই দুইয়ের কোনটিই গড়ে উঠছে না—উভয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগ প্রয়োজন।

# আবর্জনার ব্যবহার

নগরীর গার্হস্থ্য আবর্জনার শেষ গতি কি হয় এ প্রশ্নটি পরিবেশ দূষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সাধারণত এটি চলে যায় নগরীর আনাচে-কানাচে কোথাও নির্দিষ্ট স্থানে। স্তূপাকারে জমতে থাকে সেখানে। ক্রমে ক্রমে জমি ভরাটের কাজে লাগে। ঢাকার কিনারায় যাত্রাবাড়ির আবর্জনা ফেলার স্থান এমনি একটি জায়গা। এমন জায়গার অবস্থান সম্পর্কে আশপাশের বাসিন্দাদের সব সময়ই বিরক্ত তটস্থ থাকতে হয়, যেমন থাকতে হয় নিকটবর্তী পথচারীদের। বাতাস, কীট-পতঙ্গ এবং জীবাণু এর খবর যে আরো যথেষ্ট দূরে বহন করে নিয়ে যায় না তাও নয়।

আবর্জনা ফেলার জায়গা থেকে পরিবেশ দূষণের কারণ ঘটে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এর মধ্য দুটি প্রধান উৎস হলো আবর্জনার পচনে সৃষ্ট তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থ। আবর্জনার অধিকাংশই হয় পচনশীল জৈব পদার্থ। আংশিকভাবে পচা জৈব পদার্থ ও জীবাণু সমন্বয়ে তরল পদার্থটি ঐ আবর্জনা থেকে নিঃসারিত হয়। তেমনি জীবাণুর ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় প্রায় দুভাগ মিথেন ও এক ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বয়ে আবর্জনার ক্ষতিকর গ্যাস।

উন্নত বিশ্বে যথেষ্ট, কিছুটা আমাদের দেশেও আজকাল প্রবণতা হচ্ছে গার্হস্থ্য আবর্জনা থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য কিছু জিনিস উদ্ধার করে নেয়া। এর ফলে আবর্জনা স্তূপের পরিবেশ দূষণে সরাসরি যে কোন উন্নতি ঘটে তা বলা যাবে না। কারণ আবর্জনা থেকে যা আমরা সরিয়ে ফেলি তার অধিকাংশই বিক্রিয়া অযোগ্য শক্ত সমর্থ জিনিস—কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এগুলো তুলে ফেলার ফলে বরং আবর্জনা স্তূপে শুধু পচনশীল বস্তুগুলোই বেশি থাকে এবং সেগুলোর আরো ঘন অবস্থান পরিবেশ দূষণে আরো সহায়ক হয়। তবে অন্য একদিক থেকে বিভিন্ন বস্তুর পুনরুদ্ধার পচনশীল আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের কথা চিন্তা করতে এটি সহায়ক হচ্ছে। লক্ষ্য হবে শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যবহার্য বস্তু অথবা জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগানো। এই লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহে প্রযুক্তির বেশ খানিকটা অগ্রগতি ইতোমধ্যে ঘটেছে।

প্রথমে একটি যান্ত্রিক বাছাই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আয়তন এবং প্রকৃতির জিনিসগুলো আবর্জনা থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। ৫০ মিলিমিটার থেকে ছোট যেসব জিনিসকে

ক্ষুদ্রের ফলে ফেলা যায় তা ছেকে আলাদা করে বাকি জিনিসকেও কেটে কুটে ছোট করা হয় এবং পরে তাও বাছাই করা হয়। ধাতব বস্তুগুলো তুলে ফেলার পর বাদবাকি কাগজ, বোর্ড, প্লাস্টিক, কাঠ, কাপড়, চামড়া ইত্যাদিকে তাপ দিয়ে শুকিয়ে এক রকম জ্বালানি ডেলা তৈরি করা সম্ভব। এগুলো কয়লার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

গত কয়েক বছর ধরে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আবর্জনা থেকে জ্বালানি ডেলা তৈরির ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। আদিতে আবর্জনার যে আয়তন থাকে ডেলায় তা এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হয়। এতে এক কিলোগ্রাম জ্বালানি থেকে ১৮.৫ মেগাজুল তাপশক্তি পাওয়া যায়। এক কিলোগ্রাম কয়লা এটি পাওয়া যায় প্রায় ২৮ মেগাজুল। কয়লা থেকে এর গুণাগুণ অন্যান্য দিক দিয়েও অবশ্য ভিন্ন। এতে ছাই হয় বেশি, উদ্বায়ী পদার্থ তৈরিও বেশি হয়। ফলে যদিও ইউরোপে এবং যুক্তরাষ্ট্রে এর চলন বাড়ছে তেমনি আবার ওখানকার ক্রমবর্ধমান পরিবেশ খবরদারির ফলে ভবিষ্যতে আবর্জনা থেকে তৈরি জ্বালানি ডেলা আরো ব্যয় বহুল হয়ে পড়তে পারে। কথা হয়েছে ১৯৯৬ সালের মধ্যে জ্বালানি থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং ক্যাডমিয়ামের মত ভারী ধাতু নিঃসরণ নির্দিষ্ট সীমার নিচে নামিয়ে আনতে হবে। এই জ্বালানি ডেলায় এটি করতে হলে তার সস্তা হবার সুবিধাটুকু আর থাকবে না। কারণ বিশেষ ধরনের ফিল্টারযুক্ত বয়লারেই শুধু এটি ব্যবহার করা যাবে।

আবর্জনা থেকে জ্বালানি ডেলা তৈরির একটি বড় সুবিধা হল এর সঙ্গে উপজাত হিসাবে অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যও পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন বড় ধাতুখণ্ড, কাচ ইত্যাদি এর মাধ্যমে আলাদা হয়ে সংগৃহীত হয়ে যায় অন্যদিকে আবর্জনার ক্ষুদ্র অংশগুলো প্রধানত জৈব পচনশীল অংশ, গুঁড়া কাচ এবং ধুলা আলাদা হয়ে অন্য কাজে লাগে। এ কাজটি হলো কম্পোস্ট সার তৈরি। তৈরির অর্থ হলো জৈব বর্জ্যকে মাটির স্থায়ী হিউমাসে পরিণত করা যার সঙ্গে থাকবে পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড অজৈব অণু। বর্জ্যের উপর জীবাণুর কাজের ফলেই এই কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতি আমাদের অজানা নয়। গোবর ও অন্যান্য গ্রামীণ গার্হস্থ্য বর্জ্য একত্র করে স্তূপে রেখে তার উপর পানি ছিটানো এবং মাঝে মাঝে উল্‌টে পালটে দিয়ে এর সঙ্গে বাতাস মিশ্রণ করা—এটিই কম্পোস্ট তৈরির সনাতন পদ্ধতি। নাগরিক বর্জ্যের বড় আকারের সংগ্রহ থেকে এই একই কাজ করা যায় আবর্জনার এই অংশের স্তূপের মধ্য দিয়ে বাতাস চালনা করে এবং একে নির্দিষ্ট উত্তাপে এবং আর্দ্রতায় রেখে। অগ্রসরমান এ প্রযুক্তি আমাদের আয়ত্ত করতে হবে বৈ-কি।

# পুনর্ব্যবহারের আরো কথা

নগর জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ফেলনা জিনিসের আধিক্য। অনেক দরিদ্র মানুষের বসত হলেও নগরীতে মধ্য ও উচ্চ বিত্তের মানুষেরও কমতি নেই। প্রধানত তাঁরা প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত জিনিস প্রতিদিন ত্যাগ করে এক ধরনের পরিবেশ সমস্যা সৃষ্টি করছেন। গার্হস্থ্য বর্জ্য ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে কাগজ, প্লাস্টিক, কাচ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস।

টোকাইরাই হোক বা বয়স্ক সংগ্রাহকরাই হোক আপাতদৃষ্টিতে কারো কারো হস্তক্ষেপে এসব ফেলনা জিনিসের একাংশ পুনরুদ্ধার হয়। তবে উদ্ধার পদ্ধতি বা উদ্ধারের পর তার ব্যবহার তা যে পরিবেশের দিক থেকে খুব অনুকূল হয় তা বলা যাবে না। আসলে জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের ফলে নগরবাসীরা যে বিপুল ফেলন জিনিসের ভার নগরীর উপর চাপায় তা কমাতে হলে বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ধারের মাধ্যমে ফেলনা জিনিস পুনর্ব্যবহারে আনা প্রয়োজন। এতে একদিকে যেমন নতুন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রবণতা কমবে, অন্যদিকে ফেলনা জিনিস জমে জমে পরিবেশের উপর অসহনীয় প্রভাব ফেলতে দেবো না।

সারা বিশ্বের পুরো নাগরিক সভ্যতা আজ ফেলনা দ্রব্যের আধিক্যে পরিবেশ বিনষ্টির সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে এ সমস্যার বহর সমাধানের প্রচেষ্টায়ও স্বাভাবিকভাবে তারা এগিয়ে আছে। তবে এই সমস্যা সৃষ্টিতে আমরাও পেছনে নেই, যদিও সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে।

সাধারণ গড়জড়তা নাগরিক আবর্জনার মধ্যে কিসের পরিমাণ কত অংশ থাকে? এ খবর টোকাইদের জানা থাকলে থাকতে পারে তবে বিজ্ঞানী বা নগর-পিতাদের তেমন জানা নেই। তাই বিদেশের উপাত্ত দিয়ে আমরা খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। উন্নত দেশে একটি নাগরিক ডাস্টবিনে যা জমে তার নানা শরীক কি দেখা যাক শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই হলো দাহ্য পদার্থ; সে ৫০ ভাগের ৩৩ ভাগ কাগজ, ৭ ভাগ প্লাস্টিক, ৪ ভাগ কাপড় এবং বাকি অন্যান্য।

বাকি যে অর্ধেক আবর্জনা দাহ্য নয় তার মধ্যে ১০ শতাংশ ধাতব জিনিস, ১০ শতাংশ কাচ, ২০ শতাংশ তরকারীর খোসা ইত্যাদি রান্নাঘরের বর্জ্য আর বাকি অংশ স্রেফ ধুলো মাটি। এই সবকিছুর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ জিনিস রয়েছে যাকে লাভজনকভাবে পুনর্ব্যবহারের জন্য উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। কাচপাত্র, প্লাস্টিক, ধাতব জিনিস ও কিছু কাগজ এর মধ্যে পড়ে।

বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি কোন না কোন পর্যায় থেকে আমাদেরকেও শুরু করতে হবে এবং এর যে সমস্যাগুলো তা আমাদেরকেও বুঝতে হবে। যেমন প্লাস্টিকের কথাই ধরা যাক। মোড়কে ও পাত্রে যে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয় অনেক সময় তা একটা প্লাস্টিক নয় কয়েকটির মিশ্রণ। এগুলোর মধ্যে আণবিক পর্যায়ের যোগসূত্র থাকে না। ফলে পুনর্ব্যবহারের জন্য গলিয়ে নতুন করে বানাতে গেলে কি পাওয়া যাবে তা আগে থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নয়। নতুন পাওয়া প্লাস্টিকের গুণাগুণ আগেরটির চেয়ে ভিন্নতর হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন অবস্থা পুনর্ব্যবহারের অনুকূল নয়।

প্লাস্টিক উৎপাদকারীরা এই দিকটি লক্ষ্য করে এখন নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মিশ্রণের নানা প্লাস্টিককে আরো ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে ধরে রাখার জন্য Compatibiliser বা সাযুজ্য সৃষ্টিকারী অণু এর সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে। এই অণুর অনেকগুলো বাহু—অনেকটা অক্টোপাসের মত। এক এক বাহু এক এক প্লাস্টিক পলিমারকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরে রাখে বলে মিশ্র প্লাস্টিকটি ঠিক মিশ্রণ আর থাকে না—অনেকটা হয়ে পড়ে এলয় বা সংকর ধাতুর মত। একে গলিয়ে আবার বানালেও এর গুণাগুণে পরিবর্তন ঘটে না। সচেতন দেশগুলোতে এটি হওয়া উচিত—যাতে একই প্লাস্টিক বার বার ব্যবহার করা যায়।

লোহা ও ইস্পাতের পুনরুদ্ধারের ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত লাভজনক বলে এটি সব সময় গুরুত্ব পেয়েছে। তা ছাড়া বহু আবর্জনা স্তূপ থেকেও চুম্বকক্রেনের সাহায্যে এটি সহজেই আলাদা করে ফেলা যায়। গার্হস্থ্য বর্জ্যতে অবশ্য লোহার ভাগটি আসে প্রধানত টিনের কৌটা থেকে। আমরা যাকে টিন বলি তা আসলে ইস্পাতেরই তৈরি। গায়ে পাতলা করে টিনের আবরণ দেয়া আছে মাত্র। এসব টিনের কৌটা থেকে যদি ইস্পাত উদ্ধার করতে হয় তাহলে প্রথমে ছাপা রং সহ অন্যান্য ময়লা দূর করে এর থেকে টিনের আবরণ তুলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিতে ছোট ছোট খণ্ডে কেটে ফেলে ধুয়ে ময়লা দূর করার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে টিনের আবরণ আলাদা করা হয় ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে টিনকে অন্যত্র জড়ো করে ইস্পাত উদ্ধার করা হয়।

লোহা ছাড়া আর যেসব ধাতু সাধারণ আবর্জনার মধ্যে অধিক থাকে তার প্রায় অর্ধেক এলুমিনিয়াম। বাকি ধাতুর মধ্যে পিতল, তামা আর স্টেনলেস স্টিলই বেশি। এলুমিনিয়াম হালকা বলে একে অন্যান্য ভারী জিনিস থেকে আলাদা করাও সহজ। ফেলনা এলুমিনিয়াম ব্যবহার করতে যা খরচ নতুন আকরিক থেকে তৈরি করতে তার ২০ গুণ বেশি খরচ।

গাড়ির টায়ার বোধ হয় সাধারণ আবর্জনার মধ্যে সবচেয়ে অটল অনড় জিনিস। এটি অবক্ষয়িত হয়ে মিশেও যায় না, জমি ভরাটের জন্য ব্যবহার করলে সেখানে এটি উপরে উঠে এসে ইঁদুর বা মশার বাসা হয়, মাটিতে পানি আর বাতাসের চলাচলে বাধা দেয়। টায়ারের মধ্যে যে রাবার তাকে গলিয়ে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর কারণ টায়ার তৈরিতে রাবারের দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন অণুর শৃঙ্খলকে স্থায়ীভাবে সালফার পরমাণুর সঙ্গে আড়াআড়ি বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত এই বন্ধনের সহজ ইতি ঘটাবার কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত না হচ্ছে আমরা টায়ারের রবারকে আবার রবার করে তোলার কথা ভাবতে পারি না।  বরং এর অন্যান্য বিকল্প ব্যবহারের দিকে আপাতত যেতে হচ্ছে। এর থেকে অক্সিজেনবিহীন পাতনের মাধ্যমে গ্যাস ও তেল উদ্ধার সম্ভব। পাইরোলাইসিস নামে পরিচিত এই প্রক্রিয়াটি পরিবেশ রক্ষার দিক থেকে আকর্ষণীয়, কিন্তু এখনো ব্যয়বহুল।

সম্প্রতি টায়ারকে গুঁড়া করে একে অন্য দ্রব্যের সংযুক্তি হিসাবে গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন পলিইউরেথিনের সঙ্গে একে ব্যবহার করে তার গুণাগুণ আপেক্ষাকৃত সস্তায় কিছুটা উন্নত করে নেয়া সম্ভব।

ফেলনা জিনিসের সার্থক পুনর্ব্যবহার অনেকটাই নির্ভর করছে এ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর।

# বর্জ্যের উপর জীবাণুর কাজ

আমাদের নগরীগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ খুব সীমাবদ্ধ। ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী রয়েছে ঢাকার সীমিত অঞ্চল। কিন্তু সেখান থেকে যে বর্জ্য প্রবাহিত হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে তার শোধনের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। অথচ শোধন বিহীনভাবে পয়ঃপ্রণালীর মুখ নদীতে উন্মুক্ত করলে যে পানি সেখানে যাবে তা অত্যন্ত দূষিত হতে বাধ্য।

পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্যযুক্ত পানিকে শোধন করার অর্থ হলো জীবাণুর ক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে যা ঘটে সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। প্রাথমিক পর্যায়ের শোধনে কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথমে নানা রকম ছাকনির মাধ্যমে পয়ঃপ্রণালীর পানিকে ছেকে দেয়া হয়, যাতে এর মধ্যে বড় মাপের যেসব ময়লা রয়েছে তা বাদ পড়ে। এ সব ছাকনী থেকে বড় ময়লাগুলো আলাদা করে দূর করে ফেলতে হয়। এর পর একটি প্রকোষ্ঠে স্থির রেখে বর্জ্যের মধ্যে ভারী কণা, বালি ইত্যাদি থিতিয়ে যেতে দেয়া হয়। এসব ছাকন, থিতানোর প্রয়োজন বেশি পড়ে যেখানে পায়খানা থেকে আসা বর্জ্য ও অন্যান্য সব রকমের বর্জ্য রাস্তা ধোয়া বৃষ্টির পানি সহ একই পয়ঃপ্রণালী দিয়ে যায়। থিতানোর প্রকোষ্ঠে যেসব ভারী অংশ জমে সেগুলো সেখান থেকে নিয়ে নিচু জায়গা ভরাট করতে ব্যবহার করা যায়।

এরপর আর একটি থিতানোর প্রকোষ্ঠে সূক্ষ্ম কঠিন ময়লাগুলো থিতাতে দেয়া হয়। এগুলো আংশিক শোধিত কঠিন জৈব ময়লার গদ। সার হিসেবে এর বিশেষ মূল্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ময়লাগুলোকে শুকিয়ে সহজেই সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য জমিতে নিয়ে যাওয়া চলে। তবে আরো উন্নত শোধন ব্যবস্থায় এই কঠিন গাদগুলোকে একটি উষ্ণ আলাদা প্রকোষ্ঠে জীবাণুর ক্রিয়ার জন্য রেখে দেয়া হয়। জীবাণুর ক্রিয়ায় এর অধিকাংশই দাহ্য গ্যাসে পরিণত হয়। নগরের পয়ঃপ্রণালী থেকে পাওয়া এই বায়োগ্যাস জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্যাসই হয় মিথেন—যা প্রাকৃতিক গ্যাসেরও প্রধান অংশ।

এভাবে সূক্ষ্ম কঠিন অংশের গতি হওয়ার পর বাকি থাকে শুধু একেবারে জলীয় অংশটি। নদীতে ফেলার আগে ক্লোরিন মেশানোর মাধ্যমে একে নির্দোষ করে নেয়াটাই

নিয়ম। ক্লোরিন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলো মেরে ফেলে। পয়ঃপ্রণালীর এই তরল বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধও অনেকাংশে দূর করতে পারে এই ক্লোরিন।

ঘনবসতির কারণে পয়ঃপ্রণালীর উপর চাপ বেশি না থাকলে এইভাবে প্রাথমিক শোধনের মাধ্যমেই কাজ চলে যায়। কিন্তু এ শোধনে তরল বর্জ্যে অনেকখানি জৈব পদার্থ থেকে যায়। অনেক পানিতে পাতলা দ্রবণ হয়ে না মিশলে নদীর পানির জন্য এ ও পুরাপুরি নিরাপদ নয়। এ জন্য আরো এক প্রস্ত শোধন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এই শোধনে কঠিন ময়লা থিতিয়ে যেতে দেওয়ার পর ক্লোরিন মেশাবার আগে তরল অংশকে আরো ভালভাবে জৈব পদার্থ মুক্ত করা হয়। এটি করার দুটি উপায় রয়েছে। একটিতে উন্মুক্ত পাথর-শয্যার উপর এই ময়লা পানি ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকে। খোলা মেলা বড় এলাকা জুড়ে কয়েক ফুট পুরো করে পাথর নুড়ি বিছিয়ে এই পাথর শয্যা তৈরি হয়। একটি ঘূর্ণায়মান সছিদ্র নল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ময়লা পানি বের হয়ে পুরো শয্যা জুড়ে পাতলা হয়ে ছিটিয়ে পড়ে। জীবাণুগুলো ঐ পাথরের গায়ে জমতে থাকে এবং পাথর নুড়ির পৃষ্ঠের মোট আয়তন যথেষ্ট বলে এখানে জীবাণু ময়লা পানির জৈব পদার্থগুলোর উপর কাজ করার ভাল সুযোগ পায়। এভাবে পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্যে তরল অংশের প্রায় সব জৈব পদার্থ জীবাণুর ক্রিয়ায় নির্দোষ জিনিসে পরিণত হতে পারে। পাথরের গায়ে জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়।

এভাবে উন্মুক্ত পাথর শয্যার একটি অসুবিধা হলো এটি বাইরে খোলামেলাভাবে হয় বলে এলাকায় কিছুটা দুর্গন্ধ ছড়ানো স্বাভাবিক। আজকাল যে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে এ সমস্যাটি নেই। এতে তরল বর্জ্যকে একটি ট্যাংক নিয়ে সেখানে বাতাস ঢুকানো হয়। বাতাসের সঙ্গে মিশ্রণের পর একে নিয়ে যাওয়া হয় জীবাণু ভর্তি কঠিন ময়লার সংস্পর্শে। জীবাণুর ক্রিয়ায় উভয়েই নির্দোষ হতে থাকে। এই ক্রিয়ায় পানির অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়ে যায় বটে কিন্তু বাতাস মিশ্রণের ফলে অক্সিজেনের সরবরাহ বজায় থাকে। শেষ অবধি জৈব পদার্থ প্রায় নির্দোষ জিনিসে পরিণত হয়।

পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য দূষণ বস্তু হিসাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। তাই শোধনের এই বিস্তারিত ব্যবস্থার পরেই শুধু একে স্বাভাবিক পানির উৎসের সঙ্গে মিশতে দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের নগরে অশোধিত, অর্ধশোধিত মলপূর্ণ বর্জ্য হরদম পানির স্বাভাবিক উৎসের সংস্পর্শে আসছে। এ অবস্থা চলতে দিলে নগরীর জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ কিছুতেই আশা করা যায় না।

# নিরাপদ খাবার

নগরের মানুষ খাবার ফলায় না, খাবার কিনে খায়। এই খাবার কিনে খাওয়ার কারণে নগর জীবনে মানুষকে আরো একটি বাড়তি পারিবেশিক অনুষঙ্গের সম্মুখীন হতে হয়। গোলার ধান আর পুকুরের মাছ খেয়ে মানুষের যখন দিন কেটেছিল তখন খাদ্য দূষণ কিংবা বাজারের খাবারে অবাঞ্ছিত কিছু যুক্ত থাকার ভয়ে ভীত হতে হত না। কিন্তু আজ সেদিন আর নেই, নগরবাসীর জন্য তো একেবারেই নেই।

সমস্যাটি উন্নত দেশেও রয়েছে। কিন্তু সেখানে আইনের কড়াকড়ি রয়েছে, সজাগ দৃষ্টি রয়েছে, স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের। দূষিত খাবার বিক্রি করা যাবে না, ক্ষতি হতে পারে এমন কোন উপাদান খাবারে মেশানো যাবে না। কিন্তু আমাদের খাদ্য পরিবেশ রক্ষার সে রকম ব্যবস্থা নেই। আইন আছে তো তার প্রয়োগের কোন কড়াকড়ি নেই। নগরবাসীর একটি বিরাট অংশকে দারিদ্র বাধ্য করছে যেনতেন রকম খাবার কিনে খেতে। নিজের রান্নাঘরে সযত্নে তৈরি খাবার তাদের কপালে জুটে না। যে পরিবেশে যেভাবে তৈরি খাবার কিনে খাওয়ার সামর্থ্য তাদের আছে সেখানে স্বাস্থ্য বিধি মানার কোন অবকাশও নেই। রাস্তার ধূলি তাই হচ্ছে তাদের রুটির আস্তরণ, তাদেরকে মিষ্টান্ন তাই ভাগ করে খেতে হয় মাছির সঙ্গে। অথচ এর সবটুকুর জন্য দারিদ্রকে দায়ী করা যায় না। খাবার সাদামাটা হতে পারে, সস্তা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার মধ্যে ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মানা যাবে না এমন কোন কথা নেই। অদূষিত খাবার ভাল মত রান্না করে, ধুলাবালি, পতঙ্গ থেকে ঢেকে রেখে পরিষ্কার পাত্রে পরিবেশিত হলে এর থেকে ভয়ের কোন আশংকা নেই। অনেক সময় এই কাজটি করা হয় না নিছক অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে। এখানে আমাদের অনেক কিছু করার রয়েছে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, আর প্রয়োজন রয়েছে আইনের কড়াকড়ির—অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কেউ যেন খাবার বিক্রি না করতে পারে।

সচেতনতার অভাবটি যে শুধু দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু মোটেই নয়। দামী মনোলোভা খাবারে যাদের রুচি সেই ধনী নগরবাসীদের অনেকেও শিকার অন্য ধরনের অসচেতনতার। যাদের সঙ্গতি আছে তারা আজ সুসজ্জিত দোকান

থেকে কিনে খাচ্ছেন রকমারি তৈরি খাবার। এগুলো দেখতে খেতে ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর সব যে নিরাপদ তা হলফ করে বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাবটি আসে প্রধানত খাদ্যের নানা সংযুক্তি থেকে।

ছোট বড় নানা খাদ্য শিল্পে তৈরি যেসব খাবার বাজারজাত করা হয় নানাভাবে ক্রেতা আকর্ষণ সেগুলোর একটি লক্ষ্য হয়। তাই একে করতে হয় রঙে সুন্দর, স্বাদে গন্ধে, স্পর্শে লোভনীয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় সব খাবারে এত গুণ এক সঙ্গে থাকে না। অপেক্ষাকৃত কম খরচে খাবারের মধ্যে বর্ণ, গন্ধ, মিষ্টতা, নানা স্বাদ ইত্যাদি সৃষ্টি করতে গিয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া হয় অনেক সময়। এগুলোই খাদ্যের সংযুক্তি। উচ্চ মানের নিরাপদ সংযুক্তি ব্যবহার করা দূষণীয় কিছু নয়। কিন্তু মুশকিল হলো বহু আপাত নিরাপদ সংযুক্তির নানা রকম ক্ষতিকর প্রভাব আবিষ্কৃত হয়েছে যার কোন কোনটি রীতিমত বিপজ্জনক। প্রস্তুতকারকরা সবাই হয় সে খবর রাখেন না, অথবা রেখেও লাভের লোভে সেসব সংযুক্তি ব্যবহার করে চলেন। ছোটবেলায় আমরা অনেকেই মায়ের সাবধান বাণী শুনেছি বাজারের মনোহরা খাবার কিনে যেন না খাই। সস্তা আইসক্রীম, রঙীন শরবৎ ইত্যাদি থেকে ঐ নিষেধাজ্ঞাই যেন আমাদেরকে টেনে রাখতো। সব কথা ভাল করে না জেনেও মা জানতেন ঐগুলো রঙীন করতে, মিষ্টি বা সুগন্ধ করতে যা ব্যবহৃত হয় তা নিরাপদ নয়। এটি আন্দাজ করা কঠিন ছিল না। কিন্তু দামী দোকানে সুন্দর মোড়কে, বড় কোম্পানির ছাপে যা বিক্রয় হয় তাও কিন্তু সব সময় নিরাপদ নয়। আর এটি আন্দাজ করাও সহজ নয়। খাবারের সংযুক্তি, খাবার তৈরির পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাই একমাত্র আমাদেরকে এ রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

# পরিবেশ থেকে খাদ্যে

খাদ্য এমন একটি জিনিস যার উপর আমরা প্রতিদিন নির্ভরশীল এবং যাকে বাধ্যতামূলকভাবে শরীরের নিত্য গ্রহণ করতে হচ্ছে। খাদ্যে দূষণের প্রতিক্রিয়া তাই একেবারে সরাসরি। যেসব জিনিস সংযুক্তি হিসাবে আমরা ইচ্ছে করে খাদ্যে ব্যবহার করি সেগুলো যোগ করার পেছনে কারণ ছিল খাদ্যকে অধিক স্থায়ী করা, কিংবা একে বর্ণে, গন্ধে, স্বাদে আরো লোভনীয় করে তোলা। এগুলোর অনেক কটাকে আমরা নির্দোষ বলেই জানতাম। কিন্তু এখন গবেষণার ফলে জানতে পারছি এদের সব তা নয়, বেশ বড় রকমের ক্ষতিও করতে পারে কোন কোনটা। অবশ্য কোন কোনটার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে এখনো মতান্তর রয়ে গেছে।

খাদ্যে আবার আরো কিছু জিনিস মেশানো থাকতে পারে যা খাদ্যের মান উন্নয়নের জন্য আদৌ আসেনি। এদেরও কোন কোনটি ইচ্ছে করেই মেশানো হয়, ক্ষতিকর জানা সত্ত্বেও। সেগুলো ভেজাল। ক্রেতাকে ফাঁকি দিয়ে ঠকানোই এর উদ্দেশ্য। এর পেছনে শঠতার, ফন্দিফিকিরের কোন শেষ নেই। এ সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান থাকা প্রয়োজন। কোন কোন গবেষণাগার, এমন কি কোন কোন বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন বাজারের নানা রকম খাদ্য সামগ্রীর রাসায়নিক ও অণুজীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উদ্যোগ অতীতে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়াটিকে জোরদার করা প্রয়োজন। এগুলোর ফলাফলকে সর্ব সাধারণের জন্য যত বেশি সম্ভব প্রচার করে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি করাই ভেজাল রোধের সবচেয়ে বড় উপায়। আরো বেশি করে উপযুক্ত সংস্থা, ক্লাব ও উদ্যোগীদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

খাদ্যে আরো কিছু দূষণ ঘটে যেটা একেবারেই পরিবেশগত। পরিবেশের নানা দিক থেকেই খাদ্যের এই দূষণ ঘটতে পারে, অনেক সময় আমাদের অজান্তে। কীটনাশক ওষুধের কথাই ধরা যাক। কৃষির উন্নয়ন এবং উচ্চ ফলনশীল শস্যের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা কোন না কোনভাবে খাদ্যের সঙ্গে গিয়ে মেশার আশংকা থাকে। এখন মিশ্রিত বিষময় বস্তু কি পরিমাণে থাকলে সে খাদ্য গ্রহণে শরীরের ক্ষতি হয় না তার একটি সীমা রয়েছে যাকে সহ্যসীমা বলা যেতে পারে।

অনেক কীটনাশক সম্পর্কে আগে সহ্যসীমা যা মনে করা হত, এখন তা মনে করা হয় না। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কোন কোন কীটনাশক সম্পর্কে প্রচুর বিরূপ তথ্য পাওয়া গেছে এবং এদের অনেকগুলোর ব্যবহার পরবর্তীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। যেমন হেপ্‌টাক্লোর শ্রেণীর কীটনাশকে দেখা গেছে যে জমিতে স্প্রে করার পর এগুলো রাসায়নিকভাবে ভেঙে এমন বস্তুর সৃষ্টি করে যা মূল বস্তুর চেয়ে বহুগুণ বেশি বিষাক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ রকম কীটনাশকের ব্যবহার উন্নত দেশসমূহে অনেক আগেই নিষিদ্ধ হয়েছে।

ডিডিটি এক সময় সারা দুনিয়ায় কীটনাশক হিসাবে অসাধ্য সাধন করেছে। দেখা গেছে যে খড়ের মধ্যে এবং অন্যান্য গো-খাদ্যে যে ডিডিটি থেকে যায় সেটি গরুর শরীর থেকে তার দুধে যায়। গরুর দুধে ডিডিটি ক্ষতিকর পরিমাণে পাওয়া গেছে। গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে প্রাণী শরীরে ডিডিটি ক্রমান্বয়ে জমতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা সহ্যসীমা অতিক্রম করে যায়।

কীটনাশকের বিষয়টি খাদ্যে বিষক্রিয়ার সঙ্গে এত বেশি জড়িয়ে আছে যে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা FAO এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা HWO যৌথভাবে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এক একটি কীটনাশকের দৈনিক গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। জমিতে ব্যবহারের আগে এর প্রত্যেকটি খাদ্যে কি পরিমাণে দেখা দিতে পারে এবং তার সহ্যসীমা কতখানি এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে জানার নিশ্চিত উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিকভাবে খাদ্যের বিশ্লেষণ। কড়াকড়ি পরিমাপ, নিয়ম ও আইন অনুসরণ করেই উন্নত বিশ্ব একই সঙ্গে মানুষের স্বাস্থ্য ও কৃষি উন্নয়ন বজায় রাখছে। উন্নয়নের পথে এগোতে গিয়ে আমাদেরকেও শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকটা ভুলে গেলে চলবে না। আসলে যে কোন উন্নয়ন পদক্ষেপেরই একটি পরিবেশগত দিক রয়েছে। এরও বিবেচনা একই সঙ্গে হতে হবে।

# খাদ্যের উপর কারিগরি

বিশেষ করে নগর জীবনে পরিবেশের মধ্যে খাদ্যের সংযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নগর জীবনে অনেককেই বাইরের খাবার, তৈরি খাবার ইত্যাদির উপর অধিক নির্ভর করতে হয়। এসব খাবারে কি মেশানো হচ্ছে, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে সেটি জন স্বাস্থ্যের এবং খাদ্য পরিবেশের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন। এ খাবার আমরা যারা কিনছি বা খাচ্ছি তারা প্রায়ই এ সম্পর্কে ভাবি না, এ নিয়ে বেশি প্রশ্ন তুলি না। কিন্তু বিষয়টি মোটেই অবহেলা করার নয়। নিদেনপক্ষে যা খাচ্ছি তার মধ্যে কি কি মেশানো রয়েছে তা জানার মাধ্যমেই আমাদের সচেতনতার শুরু হতে পারে।

খাদ্যে সংযুক্তি বলতে কি বোঝায়? খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যা নিজে খাদ্যে পরিণত হয় এবং খাদ্যের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে, সেটিই সংযুক্তি। তবে এর মধ্যে কোন কোনটি ইচ্ছাপূর্বক মেশানো হয়। খাদ্যের গুণাগুণ পরিবর্তনের জন্য। আবার কোন কোনটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় অথবা পরিবেশ থেকে অলক্ষ্যে এসে মিশে এর সঙ্গে। আমরা সাধারণত প্রথমগুলোকে আখ্যায়িত করি সংযুক্তি হিসাবে, অন্যগুলোকে বলি দূষণ। আসলে দূষণ হতে পারে সবগুলোই। সাম্প্রতিককালে খাদ্যের সংযুক্তি বিষয়টি বেশি আলোচিত হচ্ছে বলে ভাবা উচিত নয় বিষয়টি সাম্প্রতিক। আদিম মানুষ যখন কাঁচা মাংসকে আগুনে ঝলসে খেতে শিখলো তখন সে এর মধ্যে নতুন সংযুক্ত কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণের নিশ্চয়ই পুলকিত হয়েছিল। এখন আমরা জানি কাঠ বা কয়লা পোড়ানো ধোঁয়ার মধ্যে ঝলসালে মাংসে যেসব নতুন উপাদান সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কোন কোনটি ক্ষতিকর এমন কি ক্যানসার সৃষ্টিকারীও হতে পারে। জানা সত্ত্বেও অবশ্য অনুরূপ তৃপ্তি সহকারে তার স্বাদ গ্রহণ করতে এখনো আমরা ইতস্তত করি না। আর তা মোটেই আদিম পরিবেশে নয়, নগরীর সবচেয়ে দামী ও অভিজাত পরিবেশেই বরং এটা বেশি মানানসই মনে করা হয়।

প্রাচীন মিশরীয়রা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে খাদ্যে রং মিশিয়ে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। মহাবীর আলেকজান্ডার ভারত থেকে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এখানকার এক রকম মিষ্টি স্বাদের উদ্ভিজ্জ নাম 'কন্দ'। আজকে পাশ্চাত্য জগতে যে অনেক মিষ্টি দ্রব্যকে 'ক্যান্ডি' বলা হয় তা তারই ফলশ্রুতি। মার্কোপলো

১২৭০ থেকে ১২৯৫ সাল পর্যন্ত চীন ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে কাটিয়ে এসে দক্ষিণ চীনের চিনির কলের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। পারস্য দেশে মিষ্টি স্ফটিক তৈরি করে যাকে 'শকর' বলা হত তার প্রচার দেশে দেশে হয় এর খানিক কাল পর থেকে।

লবণ খাদ্যের এমন একটি সংযুক্তি যার মোহে মানুষ আচ্ছন্ন রয়েছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই। শুধু স্বাদের জন্য নয়, খাদ্য সংরক্ষক হিসাবেও লবণের ব্যবহার অতি প্রাচীন। লবণের উৎস নিয়ে বহু যুদ্ধ হয়েছে, লবণ সংগ্রহ করতে জীবন বিপন্ন করতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সীজারের আমলে রোমান সৈন্যদের বেতন আংশিকভাবে লবণের মাধ্যমে দেয়া হত বলেই লবণের প্রতিশব্দ থেকে স্যালারিয়াম এবং আজকের স্যালারি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচ্যদেশের মশলা দ্বীপগুলোর খ্যাতিই শুরুতে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়দের টেনে এনেছিল এই দিকে। কলম্বাসের মূল লক্ষ্য ছিল এটিই, যদিও সে লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। কোর্টেজ মেক্সিকো দখল করার পর আবিষ্কার করেছিলেন যে সেখানকার আদিবাসীরা ভুট্টার রুটি তৈরি করার জন্য এর সঙ্গে চুন মিশিয়ে নরম করে। এর ফলে তাদের 'টরটিল্লা' রুটিগুলো যেমন উপাদেয় হয় তেমনি বাড়তি ক্যালসিয়ামও শরীরে আসে। এর সবই খাদ্যে সংযুক্তির কিছু পুরনো উদাহরণ।

খাদ্যে বহুতরো গুণাগুণ সৃষ্টির জন্য সংযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ সবই এর অন্তর্গত। তাছাড়া বেশি দিন খাবারকে ভাল রাখার জন্যও সংযুক্তি ব্যবহার করা হয়। খাবারের খাদ্য গুণও বাড়িয়ে নেয়া যায় কিছু অতিরিক্ত উপাদান মেশাবার ফলে। অনেক বিশেষ উদ্দেশ্যেও সংযুক্তি ব্যবহৃত হয়—যেমন ফুলিয়ে তোলা, নরম করা, মিষ্টি করা, স্বচ্ছ করা, ফেনায়িত করা, অক্সিডেশন রোধ করা, ছত্রাক জমতে না দেয়া ইত্যাদি কত কি?

প্রশ্ন হল এর কোনটি নিরাপদ, কোনটি নিরাপদ নয়। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে জানতে হবে খাদ্যে আসলে কি মেশানো হয়েছে, কি পরিমাণে, তার প্রত্যেকটির প্রভাব কি হতে পারে।

# কোন খাবারে কি?

খাদ্যে সংযুক্তি আমাদের পরিবেশে নানাভাবে আসবে। এদের চেনা প্রয়োজন, বাছ-বিচার প্রয়োজন। যেমন ধরা যায় মিষ্টি কারক দ্রব্যের কথা। প্রাচীন কাল থেকে আমরা মিষ্টান্ন তৈরিতে বা খাবারকে মিষ্টি করার জন্য প্রাকৃতিক দ্রব্য গুড় বা চিনি ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু এখন দিন বদলেছে, বাজারের অনেক খাবারেই এখন কৃত্রিম মিষ্টিকারক জিনিস ব্যবহৃত হচ্ছে। গুড় বা চিনির মত চোখ বুজে খাবার মত জিনিস এগুলো নয়।

মিষ্টান্ন, আইসক্রীম, জেলী, কোমল পানীয় ইত্যাদি বহু রকমের খাবারে চিনির বদলে কৃত্রিম মিষ্টিকারক ব্যবহারের নানা সুবিধা রয়েছে। এতে দাম কম পড়ে, স্বল্প সংযুক্তিই যথেষ্ট হয়, অধিক ক্যালোরির সমস্যা কমে। যেমন ১৮৭৯ সালে আবিষ্কৃত স্যাকারিন চিনির চেয়ে ২০০ থেকে ৫০০ গুণ বেশি মিষ্টি। এই স্যাকারিন দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোথায় যে কিসের সঙ্গে এটি রয়েছে আমরা খেয়ালও করি না। স্যাকারিনের আবিষ্কারের ৬০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে সাইক্লেমেট। এটি স্যাকারিনের তুলনায় অনেক কম মিষ্টি। কিন্তু এটি ব্যবহারের অন্য কারণ রয়েছে।

স্যাকারিন ব্যবহার করলে খাবার যেভাবে মিষ্টি হয়, সেটি চিনির মত প্রভাব ঘটায় না জিহ্বায়। ধীরে ধীরে মিষ্টতার সংবেদন বেড়ে এটি অনেকক্ষণ বজায় থাকে যার ফল হয় জিহ্বার মিষ্টি স্বাদ গ্রহণে এক ধরনের শ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই অপ্রিয় প্রভাবটি কমে যায় যদি স্যাকারিনকে সাইক্লেমেটের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া যায়। যেমন দশভাগ সাইক্লেমেট একভাগ স্যাকারিনের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি সুকেরিল বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বহুদিন এসব জিনিসের কোন ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠেনি। ১৯৬৮ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয় যে সাইক্লেমেটের অতিরিক্ত গ্রহণ শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ লিভার, কিডনী ইত্যাদির এবং বিভিন্ন রস স্রাবক গ্রন্থির ক্ষতি করতে পারে। এর কিছুদিনের মধ্যে পরীক্ষায় দেখা গেল যে অধিক মাত্রায় সাইক্লেমেট ক্যান্সারের সৃষ্টি করতে পারে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে উন্নত বহু দেশে সাইক্লেমেটের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

সাইক্লেমেটের গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানীদের স্যাকারিনের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে। ১৯৭০ সালেই এক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে বিশেষ পরিস্থিতিতে স্যাকারিন মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এ সবের ফলে পরের বছর অনেক দেশে স্যাকারিনকে গ্রহণযোগ্য খাদ্য-সংযুক্তি তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। তবে স্যাকারিনের ক্ষতিকারকতার বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত এখনো রয়ে গেছে।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, কৃত্রিম মিষ্টিকারক নানা দ্রব্য যেগুলোকে আমরা দীর্ঘদিন নির্দোষ মনে করে এসেছি এরা মোটেই তা নয়। বিশ্বব্যাপী এখন কৃত্রিম মিষ্টিকারক মাত্রকেই সন্দেহের চোখে দেখার একটি প্রবণতা এসেছে—সঙ্গত কারণেই অন্তত যতদিন এর কোনটি সন্দেহাতীতভাবে নির্দোষ বলে প্রমাণিত না হবে ততদিন আমাদেরকেও এই প্রবণতা বজায় রাখতে হবে। কৃত্রিম মিষ্টিকারকের বেপরোয়া ব্যবহার বা আমাদের খাদ্যে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয় সে সম্পর্কে কড়া নজর রাখতে হবে।

তৈরি খাদ্যে, টিন জাতীয় খাদ্যে একটি সংযুক্তি প্রায়শই ব্যবহৃত হয় তা হলো মনোসোডিয়াম গ্লুটামাইট যা টেস্টিং সল্ট বলেই বেশি পরিচিত। জাপানীরা সমুদ্রের শৈবাল ব্যবহার করে খাবারের স্বাদ গন্ধ বাড়িয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। ১৯০৮ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কিকুনী ইকিদা এই শৈবালের কোন উপাদানটি এতে কাজ করছে তা বের করতে গিয়ে গ্লুটামাইট আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে এটি সয়সসে, নানা রকম চীনা ও জাপানী খাবারে এবং সাধারণভাবে টিনজাত খাদ্যে স্বাদ বৃদ্ধিকারী সংযুক্তি হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এখন মনোসোডিয়াম গ্লুটামাইটের নির্দোষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। অতীতের পরীক্ষায় শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এমন আশঙ্কা অতিরিক্ত গ্লুটামাইট গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। ১৯৬৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে গ্লুটামাইটের ক্ষতিকারক দিকে আরো খবর। এর ফলে মাথা ধরা, হাত পা জ্বলা, বুক ব্যথার সমন্বয়ে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যার নাম দেয়া হয়েছে—চীনা রেস্তোরাঁ ব্যাধি। বলা বাহুল্য সঙ্গত কারণেই এই নাম।

# ভাল জীবাণুর কথা

জীবজগতে মানুষকে বাস করতে হয় আরো অসংখ্য রকমের জীবের সঙ্গে সহ অবস্থানে। এর মধ্যে অনেক জীব মানুষের জীবন-যাত্রার জন্য সহায়ক, তাই সেগুলোর সান্নিধ্য আমাদের কাম্য। আবার অনেক জীব আমাদের আছে উপদ্রব্য হয়ে দেখা দেয়। উভয় প্রকারের জীবই কিন্তু আমাদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবেশের প্রশ্নে এদের অবস্থানের বিষয়টি অবহেলা করার উপায় নেই।

পরিবেশের যেসব জীব আমাদেরকে ভাবায় এবং ভোগায় তাদের এক দল আণুবীক্ষণীক। এদের আমরা জীবাণু, ফাঙ্গাস, ভাইরাস ইত্যাদি নানাভাবে চিহ্নিত করি। চাক্ষুষ দেখি না বলে এদের কার্যকলাপের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়, সরাসরি এদের সঙ্গে নয়। এদের অনেকগুলো আমাদের জীবনের এবং পরিবেশের অনেক অনুকূল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কথাই ভাবা যাক। জীবাণুর সাহায্য ছাড়া আমরা দৈ, পনির ইত্যাদি অনেক উপাদেয় খাবার থেকে বঞ্চিত হতাম। আবার বসবাসের পরিবেশের দিকে তাকালে দেখি জীবাণু যদি পচনক্রিয়ায় সাহায্য না করত তাহলে আমাদের আবাসস্থল শিগ্‌গির আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যেত।

পরিবেশের উপকারী জীবাণুগুলোকে আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা উপকারী জীবাণুর উপকারকে আরো বাড়িয়ে নিতে এখন যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছেন। বায়োটেকনোলজী বা জেনেটিক কারিগরির মাধ্যমে জীবাণুর উপকারী ব্যবহার বহুগুণে বিস্তৃত করার এক বিশাল দিগন্ত এখন উন্মোচিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষ খাদ্য উৎপাদনের, নতুন নতুন ওষুধ ইত্যাদি ব্যাপক আকারে উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এবং সরাসরি জীবাণুর মাধ্যমে উভয়ভাবে এ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু জীবাণু ফাঙ্গাস্ ভাইরাস এসব সাধারণত এর ক্ষতিকর অনুষঙ্গ নিয়েই আমাদের জীবনে এবং আমাদের ভাবনায় আসে। অবশ্য এর যথেষ্ট সঙ্গত কারণও রয়েছে। এদের অনেকগুলো সরাসরি আমাদের শারীরবৃত্তকে আক্রমণ করে রোগব্যাধির কারণ হয়। অনেকগুলো আক্রমণ করে আমাদের পণ্য অতি প্রয়োজনীয় পশুপাখি আর চাষের ফসলকে। এই শেষোক্তগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আবার আমাদের পরিবেশে

আসছে বহু রকমের ওষুধ আর রাসায়নিক দ্রব্য। সেগুলো তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে অন্যদিক থেকে অন্য রকম পরিবেশ দূষণ। তাই জীবাণু প্রতিরোধ করতে গিয়ে জীবাণু নাশকের বিষক্রিয়া এবং পরিবেশের অবাঞ্ছিত স্থানে সেটা চলে যাওয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়।

এ প্রসঙ্গে এন্টিবায়োটিকের কথা আসতে পারে। এন্টিবায়োটিক ওষুধ হিসাবে মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এর জীবাণুনাশক ক্ষমতার জন্য। বলতে গেলে আধুনিক কালে চিকিৎসা শাস্ত্রে এটি অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু এন্টিবায়োটিকের অন্য কিছু ব্যাপক ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে হচ্ছে এবং আমরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নই। পোষা পশুপাখি পালনে এবং কৃষিতে রোগ নিবারক হিসাবে প্রচুর এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা ছাড়া বহু খাদ্য শিল্পে খাদ্যের সংরক্ষক হিসাবেও এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দুগ্ধবতী গাভীর নানা রোগে এন্টিবায়োটিক নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে যে ব্যবহারের বেশ কয়েক দিন পরেও গাভীর দুধের মধ্যে সামান্য পরিমাণ এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়। এ জন্য কোন কোন এন্টিবায়োটিকের এ রকম ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। কারণ এন্টিবায়োটিক জীবাণুনাশক বলেই শরীরের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। প্রয়োজনীয় জীবাণুকেও এটি ধ্বংস করতে পারে। আবার স্বল্প পরিমাণে বার বার গ্রহণ করার ফলে শরীরে ক্ষতিকর জীবাণু ক্রমে এন্টিবায়োটিকের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। পরে প্রয়োজনের সময় এন্টিবায়োটিক গ্রহণে কোন সুফল পাওয়া যায় না। গরুর দুধের সঙ্গে বা অন্য কোন খাদ্যের সঙ্গে অজান্তে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে এমন কথা নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করি না। কিন্তু পরিবেশে ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে মুক্ত থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শুধু পশুরোগের চিকিৎসার জন্যই নয়, এন্টিবায়োটিক পশুখাদ্যে মিশিয়ে খাওয়াবার রীতিও উন্নত খামার ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। এতে পশুর বৃদ্ধি রোধকারী জীবাণুগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। টিনজাত খাদ্যের পচন নিবারণ আরো নিশ্চিত করতে এর সঙ্গে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কেউ কেউ করে থাকেন। এ সবের মোটফল হচ্ছে পরিবেশের মধ্যে এন্টিবায়োটিকের আধিক্য। সচেতনার অভাব ঘটলে এভাবেই সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের আধুনিক দূষণের শিকার আমরা হবো।

# নিরুপদ্রব প্রকৃতি

জীবাণু-ভাইরাস আমরা দেখি না, তাদের কাজ দেখি। কিন্তু পরিবেশ অন্য যেসব জীবন্ত উপদ্রব হয়েছে সেগুলো চোখে দেখি, কামড় খাই কিংবা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই। গ্রাম্য জীবন কিংবা নগর জীবন কোন জীবনেই এসব কীটপতঙ্গে উৎপাত থেকে মুক্ত নই। এদের সঙ্গে কম বেশি সহঅবস্থান করেই আমাদের চলতে হয়। এরা আমাদের পরিবেশের অংশ।

একদিক থেকে পরিবেশের বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীর পরস্পরের মধ্যে রয়েছে শিকার শিকারীর অথবা খাদ্য খাদকের সম্পর্ক। শিকারীকে যদি উপদ্রব বলা যায় তাহলে শেষ অবধি মানুষকেই বলতে হয় সব রকম জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক উপদ্রব। সেটি অবশ্য অন্যান্য জীবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের অনেকগুলোই মহা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে। স্বাভাবিকভাবেই এর থেকে আমরা উদ্ধার পেতে চাই। পরিবেশ থেকে এদের দূর করতে চাই। বুঝে শুনে যদি এ কাজ না করি তাহলে আবার এর মাধ্যমেই আমরা পরিবেশের আরো অবনতি ঘটাই।

জীবন্ত উপদ্রব যেসব সময় কীট-পতঙ্গই হবে এমন কোন কথা নেই। এরা উদ্ভিদও হতে পারে। এই যে শহরে জলাশয়গুলো নষ্ট হচ্ছে তার কারণ বদ্ধ জলাশয়ে অধিক বর্জ্য গিয়ে তাতে অনিয়ন্ত্রিত আলজি শৈবাল জমানোর ফলে। কচুরিপানা আর একটি বহুল পরিচিত উদ্ভিদ উপদ্রব। এও জলাশয়ের ও জল ধারার পরিবেশের শত্রু। কীট-পতঙ্গের কথায় যদি যাই তাহলে আমাদের নগর জীবনে সবার আগে মনে পড়বে মশার কথা। তারপর তেলাপোকা, ইঁদুর এসব তো আছেই। বাড়ির রান্নাঘরে ভাড়ার ঘরে তাদের রাজত্ব। রাস্তার ধারে খাবার দাবার তৈরি ও বিক্রয় করার কাজে বড় উপদ্রব মাছি। বাগান করতে গেলে, একটু সজি বা অন্য কিছু লাগাতে গেলে মাটিতে মাটির উপরে আরো কত রকমের কীট-পতঙ্গের উপদ্রব। বেওয়ারিশ কুকুর বিড়ালও শহরে কম অনর্থ ঘটায় না।

আমরা যখন এসব উপদ্রবের কথা ভাবি তখন যখন যেটি ভোগায় বেশি তার কথাই ভাবি আলাদা করে। মশার উৎপাতে যখন টেকা দায় হয় তখন মশার কথা, বাড়িতে ইঁদুর যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মাথায় শুধু ঘোরে ইঁদুরের কল কিনবো বা

বেড়াল পুষবো। জলাশয়ের কাছে গেলে মনে পড়ে কচুরী পানার কথা। আমরা ভুলে যাই যে পরিবেশের মধ্যে সব জীবন একটি পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বাস করে। এদের একটি বিহিত করতে গিয়ে অন্যটির কথা ভুলে গেলে আরো বড় অনর্থের কারণ ঘটতে পারে।

পরিবেশের উপর একটি সুস্থিতি সব সময় কাজ করে। যে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ পশুপাখি এর উপর আশ্রয় করে তারা পরস্পর নির্ভরশীল। এর একটি বেশি বেড়ে গেলে যেমন অন্যের ক্ষতি হয়, তেমনি বেশি কমে গেলেও ক্ষতি হয়। এরা সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে। এর ফল সব সময় শুভ হয় না।

যেখানে মানুষ বাস করে না সে রকম জলাশয় প্রাকৃতিক ভারসাম্যই জীব জগতে সুস্থিতি দেয়। মানুষ তার বসত গড়ার পর উন্নয়নের কাজে যখন হাত দেয় তখন অনিবার্যভাবে এই সুস্থিতি বিনষ্ট হয়। মানুষ জলাশয়, জলধারাগুলোর গতি-প্রকৃতি বদলে দেয়, রাস্তা-বাঁধ এ গুলো তৈরি করে, গাছ কেটে ফেলে, জংলা জায়গায় আবাদ করে অনেক জীবের স্বাভাবিক আবাস নষ্ট করে দেয়। তার উপর মানুষ উন্নয়নের প্রয়োজনে পরিবেশে নানা রকম দূষণ সৃষ্টি করে যা তার নিজের জন্য তো বিপজ্জনক বটেই, জীবজগতের ভারসাম্যও দারুণভাবে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম। অনেক সময় উন্নয়নের জন্য এমন সব পদক্ষেপ নিতে হয় একের পর এক যা এই বিপর্যয়কে বাড়িয়েই চলে।

উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ করতে গিয়ে শস্যের এমন সব জাত এসেছে যেগুলো কীট-পতঙ্গের আক্রমণের সহজ শিকার হতে পারে। ফলে কীটনাশক এসেছে এর সঙ্গে সঙ্গে। এই কীটনাশকেরও নতুন নতুন দক্ষতা এবং নতুন নতুন প্রকার প্রয়োজন হচ্ছে। কীটনাশক তার কাজ হয়তো করছে কিন্তু আরো কিছু বেশিও করছে। যে পতঙ্গকে বিনষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল না সেটিও এই কীট নাশকের শিকার হচ্ছে। হয়তো এতেও সরাসরি কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্যের উপর বড় রকমের হাত যদি এভাবে পড়ে তার সুদূর প্রসারী ফল খারাপ হবে।

তাছাড়া কোন জায়গায় কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের উদ্যোগ যখন আমরা কীটনাশকের মাধ্যমে নিই তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কীটনাশকটি শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ আছে। এর কাজ করার পর এটি বিলীন হয়ে গেছে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। এর প্রভাব পরিবেশের অন্যান্য অংশে গড়ায়, পানি বা বাতাস বাহিত হয়ে অন্যত্র বিষক্রিয়া ঘটায়। এমন কি যে শস্য রক্ষার জন্য এ প্রয়োজন তার মধ্যেও এর খানিকটা আশ্রয় করে। তাই বলে কি কিছু করা যাবে না? নিশ্চয় যাবে, সব দিক সম্পর্কে সচেতন থাকলেও আমরা সঠিক প্রযুক্তিটা অবশ্যই খুঁজে নিতে পারব।

# নগররূপী দ্বীপ

নগরজীবন একটি দ্বীপে থাকার মত। এর বাঁচার সব জরুরী রসদ আসে গ্রামগুলো থেকে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্য। দেশে মানুষ বেড়েছে, তার মধ্যে নগরে বেড়েছে আরো দ্রুত হারে। এত মানুষের খাদ্য যোগাবার জন্য দরকার হয়েছে কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি আমাদের অধিক খাদ্য দিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু দিয়েছে যা আমরা চাইনি তা হলো রাসায়নিক দূষণ। এক সময় খুব বেশি দিন আগে নয় আমাদের জমিতে নানা মৌসুমে নানা রকম শস্য ফলানো হত। এটি শুধু বিভিন্ন শস্যের চাহিদার কারণেই করা হত না। লক্ষ্য করলে দেখা যেতো যে এর একটি জমি থেকে যা নিয়ে নিত অন্যটির তার কিছুটা ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকত, কোন কোন সময় জমিকে জিরোবার সময় দেয়াও সম্ভব হত।

খাদ্যের প্রয়োজন বাড়াতে ওসব অভ্যাস এখন আর চিন্তা করা যায় না। একের পর এক ফসল ফলানো চাই এবং তার সবই হবে একটিই শস্য ধান—তাও উচ্চ ফলনশীল ধান। এই প্রয়োজন থেকে এসেছে অন্য প্রয়োজনগুলো। জমি থেকে ক্রমাগত পুষ্টি নিয়ে নেবার ক্ষতি পূরণ করতে হলো প্রাকৃতিকভাবে নয়, প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে। নতুন জাতের ধান নিয়ে এলো নতুন নতুন কীট-পতঙ্গ, রোগ বালাইয়ের উপদ্রব। অবশ্য এরও প্রতিকার পাওয়া গেল কীটনাশকের মধ্যে।

বিপত্তি যেটি দেখা গেল তা হলো এর কোনটি পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ নয়। আরো যা অসুবিধা তা হলো এই প্রক্রিয়াটি ক্রমবর্ধমান। জমি ক্রমেই বেশি বেশি করে সার চাইবে। যে কীটনাশকের অল্পতে কাজ হচ্ছে, কাল হয়তো একই কাজ করতে তা লাগবে বেশি। এমন কি হয়তো এটি আর কাজই করবে না, প্রশ্ন হলো এই উভয় সংকটের কি কোন সমাধান নেই? ফসল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন রাসায়নিক সার, প্রয়োজন কীটনাশক, আগাছা নাশক ইত্যাদি। এরা পরিবেশ দূষণে সাহায্য করে, মাটির স্বাভাবিক সমৃদ্ধি নষ্ট করে, অথচ প্রয়োজন এদের বেড়েই চলে কিন্তু উপায় কি? উপায় হলো সচেতনতা। উপায় হলো পরিমিত বোধ, অতীতের মত জমিকে তার স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় রাখতে সাহায্য করা উন্নত কৃষি সত্ত্বেও। জমি থেকে পাওয়া সম্পদের

খানিকটা জমিকে ফিরিয়ে দিয়ে এটি যে করা যায় এ কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। সেই অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে—যেখানে যতখানি সম্ভব।

জৈব সার জমিকে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছে, এখনো করবে। জমির নাড়া জমিতে পচলে সার হয়। গোবর, পাতা, খড় পানিতে গর্তে ফেলে রেখে, মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে তৈরি হতে পারে কম্পোস্ট সার। এ সার জমিতে কালো হিউমাস বাড়ায়। জমিতে প্রাণের সঞ্চার করে। এ মাটিতে থাকবে কেঁচোর অবাধ বিচরণ। এ মাটিতে আগাছা থাকবে, কিন্তু সেই আগাছা দূর করার জন্য উদ্ভিদ বিধ্বংসী কিছুর প্রয়োজন হবে না। পুরনো পদ্ধতিতেই তা দূর করা যাবে। সম্ভব মত ফসলের বৈচিত্র্য আনতে হবে তাহলে কীট-বালাই এমনভাবে পেয়ে বসবে না।

কিছু কিছু কীট-পতঙ্গের দরকারও রয়েছে, পরাগায়নের জন্য দরকার, পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য দারকার। কীটনাশক ছিটাবার আগে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে এটি নির্বিচারে যাবতীয় কীট-পতঙ্গকে ধ্বংস করবে না। প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে কাজ করতে দিলে অনেক সমস্যা আপনা থেকেই কমে আসবে। একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে জ্বালানি ব্যয়ের হিসাবে রাসায়নিক পদ্ধতির কৃষির তুলনায় প্রাকৃতিক পদ্ধতির কৃষির ব্যয় একক ফলন প্রতি অন্তত: আড়াই গুণ কম। অন্যসব বিষয় বাদ দিলেও জ্বালানি ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাসায়নিক দ্রব্যের উপর আমাদের কৃষির নির্ভরশীলতা কমানো প্রয়োজন। সেটিও শেষ পর্যন্ত পরিবেশেরই বিষয়। প্রয়োজন হবে নতুন রকমের কীটনাশক। এগুলো ক্ষতিকর কীটের বিরুদ্ধেই আমরা ব্যবহার করছি। কিন্তু যে কারণে কীটের বিনাশ করে সে কারণে আমাদেরও ক্ষতি করছে। আর ক্ষতি করছে পরিবেশের আরো অনেকের যারা আমাদের পরিবেশের বন্ধু। খাদ্যের চেইনের মধ্যে প্রবেশ করে বলে এটি কেঁচো, কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি, নানারকম পাখি সবার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। কীটনাশক আর এই সার শেষ পর্যন্ত গড়ায় নানা জল ধারায়, দূষিত করে আমাদের পানির সরবরাহকে, ক্ষতিগ্রস্ত করে মৎস্য সম্পদ।

কৃষিতে রাসায়নিক উপাদান যোগের প্রাবল্য আসার পর থেকে উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশের ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষতি আরো বেশি হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এখানে বিষয়গুলো সম্বন্ধে মানুষের শিক্ষা সচেতনতা ছিল কম। আপাতত চাষের ক্ষেত্রে ফলন বেড়েছে এই নিয়েই মানুষ সন্তুষ্ট থেকেছে, এর অন্যান্য প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি। সম্প্রসারণের উদ্যোগে ব্যবহার রীতি ইত্যাদি যে রকম গুরুত্ব পেয়েছে সাবধান বাণীগুলো তেমন গুরুত্ব পায়নি। ১৯৮১ সালে অক্সফ্যামের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি বছর সাড়ে নয় লক্ষ মানুষ কীটনাশকের দুর্ঘটনাজনিত বিষক্রিয়ায় ভুগেছে। ল্যাটিন আমেরিকার কৃষিজীবী মানুষের রক্তে বিষময় ডিডিটির পরিমাণ পাওয়া গিয়েছে গড়পড়তা উত্তর আমেরিকার মানুষের দেহে পাওয়া পরিমাণের চেয়ে ১১ গুণ বেশি। এমন সব কীটনাশক ইত্যাদি উন্নয়নশীল বিশ্বে অবাধে রফতানি করা হয়েছে যা উৎপাদনকারী উন্নত দেশগুলোতে নিষিদ্ধ।

# এজেন্ডা-২১ : সুস্থ কৃষি

১৯৯২ সালে সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রনায়করা এবং বিশেষজ্ঞরা যখন ব্রাজিলের রিও ডে জেনেরিওতে ধরিত্রী সম্মেলনে মিলিত হয়েছিল তখন তাঁরা একটি কর্মসূচিতে একমত হয়েছিলেন। সেই কর্মসূচিটি হলো এজেন্ডা-২১ নামে পরিচিত। এই কর্মসূচি প্রণয়নের পেছনে যে মৌলিক স্বীকৃতির কাজ করেছে তা হলো দুনিয়ার দেশে দেশে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলোকে যেভাবে পরিচালিত করছি সেভাবে চললে বিশ্বের কোথাও পরিবেশকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না, টেকসই উন্নয়নও সম্ভব হবে না সে ধনী দেশই হোক আর দরিদ্র দেশই হোক। কাজেই আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ডের ধারা বদলাতে হবে। এই পরিবর্তনের পালা শুরু করতে হবে এই মুহূর্ত থেকে আর তা করে যেতে হবে একবিংশ শতাব্দীকে বরণ করার মধ্য দিয়ে। একটি নতুন শতাব্দীকে যথাযথভাবে আবাহন করার কর্মকৌশল নিয়েই রচিত হয়েছে এই এজেন্ডা-২১।

এজেন্ডা-২১ যেসব বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে তার মধ্যে একটি হলো কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান উন্নয়নের ধারাকে পরিবেশ ও টেকসই হবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্বিবেচনা। ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হলো ভূমির উর্বরতাকে চিরতরে পঙ্গু না করে এটি কিভাবে করা সম্ভব। বর্তমান হিসাবে দেখা যায় আগামী দুই হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে আটশ কোটির মত। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ জনসংখ্যা বাস করবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হবে অধিক হারে খাদ্য উৎপাদন। দুই হাজার সালের মধ্যেই খাদ্যের চাহিদা নব্বই এর দশকের শুরুর তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার কথা। এই হারে অধিক খাদ্যের যোগান দেয়ার ক্ষমতা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার জন্য এজেন্ডা-২১ এর মধ্যে একটি কর্মসূচি হলো টেকসই কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। এতে বিভিন্ন দিক থেকে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নীতি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত উদ্যোগ। সকল আইন প্রণয়ন, নীতি প্রণয়ন এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণকে এমন হতে হবে যেন খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরকে এমন অবাধ করতে হবে যেন সব দেশ খাদ্য উৎপাদন সংরক্ষণ, বন্টন ইত্যাদিতে সর্বোত্তম সুযোগ-সম্ভাবনার অধিকারী হতে পারে।

সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া এরকম নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই ভূমি, পানি, বন সম্পদ ও প্রযুক্তিতে সবার অধিকার থাকাটিকে জরুরী মনে করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যন্ত এ অধিকার যেমন বিস্তৃত হবে তেমনি সেখান পর্যন্তই সচেতন প্রচেষ্টার দায়িত্বটিও বিস্তৃত হবে। কৃষিতে দেশের সনাতন যে প্রযুক্তি জ্ঞান রয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে হবে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে। কিন্তু তা কোন সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে নয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ মহিলাদের কথা এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টাগুলোকে বাস্তবায়িত করতে হবে সর্বস্তরে মহিলাদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

ভূমির উৎপাদনশীলতার বিষয়টিকে এজেন্ডা-২১ দেখেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক সার ভূমিতে প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিকভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। কিন্তু স্থান ও কালে খুব সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেই শুধু একে সুবিবেচনার কাজ বলে গণ্য করা যায়। রাসায়নিক সার একদিকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা ধীরে ধীরে অবক্ষয়িত করে। ফলে এর মধ্যে কোন সুস্থিতি থাকে না—টেকসই উন্নয়নর দিক থেকে এটি সমর্থনযোগ্য নয়। সুস্থিতি সম্পন্ন কৃষি হলো কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির জৈব উপাদানগুলো যথাসম্ভব ভূমিতে ফিরিয়ে দেয়া। উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে এই সুস্থিতির মধ্যে থেকেই করতে হবে। এরকম কৃষির মধ্যে শস্য আবর্তন, জৈব সারের ব্যবহার, প্রাকৃতিক কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি আহার নতুনভাবে গুরুত্ব পাবে। ভূমিকে সজীব রাখার জন্য এগুলো অপরিহার্য ব্যবস্থা। শস্য আবর্তন বিভিন্ন মৌসুমে, বিভিন্ন বছরে ভিন্নতর ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি পুষ্টি ব্যবহারে এবং পুষ্টি সৃষ্টিতে ভারসাম্য রাখে। একই কথা জৈব সারের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরকম আর্সেনিক বা জৈব-ভিত্তিক কৃষির প্রযুক্তি এখন যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। এই উন্নততর প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এর মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

সুস্থ কৃষির আরেকটি শর্ত হলো এতে যে সংখ্যক মানুষের শ্রম দরকার ঠিক ততজনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা। এর মানে হলো পল্লী অঞ্চলের অনেক মানুষকে কৃষি খাতের বাইরে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। মৎস্য চাষ, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ইত্যাদির বিস্তার ঘটিয়ে এটি সম্ভব। কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাতের জন্য অর্থ সংস্থানের জন্য উপযুক্ত ঋণ যোগানকারী সংস্থাও এই সঙ্গে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। আসলে পল্লী পর্যায়ে এজন্য যথাযোগ্য অবকাঠামো সৃষ্টিই এমনি একটি পরিবেশে অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের পথ করে দেবে। এই অবকাঠামোর মধ্যে আর্থিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন দেশে ভূমিক্ষয়, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা এবং ভূমি উর্বরতা হ্রাস ক্রমবর্ধমান হারে ঘটে চলেছে। এজেন্ডা-২১-এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে এর প্রতিবিধানের

ব্যবস্থা করতে আকাঙ্ক্ষি। দেখা গেছে এসব অনেক কিছুর মূলে রয়েছে সঠিক তথ্যের অভাব এবং ভূমির অযথাযথ ব্যবহার। দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশের উপর প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরিকল্পনা নেয়া ও তার বাস্তবায়নের ফলে এরকম অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এভাবে বন্যার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে গিয়ে দেয়া বাঁধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা অথবা ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারে সৃষ্টি করেছে। লবণাক্ততা। এজেন্ডা-২১ এর লক্ষ্য হলো তাৎক্ষণিক লাভের আশায় আমরা যেন আমাদের ভবিষ্যৎকে বিসর্জন না দিই।

# জিন-কারিগরির নতুন কৃষি বিপ্লব

প্রায় চল্লিশ বছর আগে সবুজ বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে আমরা খাদ্য উৎপাদনের বিষয়টিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছি। কিন্তু আগামী ২০/৩০ বছরের মধ্যে সবুজ বিপ্লবের সুফলের উপর ভরসা করে বসে থাকার দিন আমাদের ফুরিয়ে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কৃষি উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়াতে হবে তাতে বর্তমান পরিবেশ দূষণকারী প্রক্রিয়া বজায় রেখে সেটি করা প্রযুক্তিগত এবং স্থায়ীত্বগত উভয় দিক থেকেই অসম্ভব হবে। স্পষ্টত আমাদেরকে নতুন ও বিকাশমান প্রযুক্তির ফলপ্রসূ প্রয়োগ ঘটিয়েই এই সংকটের মোকাবেলা করতে হবে। এরকম প্রযুক্তির পুরোভাগে রয়েছে ডিএনএ পুনঃ সংযোগের মাধ্যমে নতুন জৈব প্রযুক্তি। খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে গিয়ে অসম্ভব পারিবেশিক মূল্য দিতে যে অশুভ সম্ভাবনা সেটি রোধ করার ক্ষমতা রাখে এই জৈব প্রযুক্তি।

ডিএনএর পর্যায়ে যথাযথ পরিবর্তন ঘটিয়ে উদ্ভিদকে মাটির প্রাকৃতিক সার গ্রহণে অধিকতর উপযোগী করে যেমন তোলা যায়, তেমনি একে নানা রকম রোগ-বালাইয়ের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধী করে তোলা যা। আর যদি সম্ভব হয় তবে ক্রমবর্ধমান হারে রাসায়নিক সার আর রাসায়নিক কীটনাশকের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে আমাদের পরিবেশ। ডিএনএ পুনঃসংযোজনের প্রযুক্তিটি আসলে কি? এটি হলো বিশেষ গুণাগুণের তোড়ে সমন্বিত জিনের অংশকে এক জীবের ডিএনএ থেকে কেড়ে নিয়ে তা অন্য জীবের ডিএনএর মধ্যে সংযোজন। এই শেষোক্ত জীবকে আমরা এ সব বিশেষ গুণে গুণান্বিত করে তুলতে চাইছি। এর মধ্যে চমৎকার ব্যাপারটি হলো যে জীনের ডিএনএ-তে কাংঙ্খিত জিনসমূহের নতুন সংযোজন করা হলো তা এর আচরণে প্রকাশ পায় এবং পুরুষাণুক্রমে এর বংশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যদিও এই কৌশলের মূল নীতি বেশ কিছুদিন ধরে জানা রয়েছে, এটি সত্যিকার অর্থে গুরুত্ব পাচ্ছে এখন। ফলে গত ১০/২০ বছর ধরে যে কাজ ধীরে এগুচ্ছিল সেই বিভিন্ন জীবের গুণাগুণ তার ডিএনএর মধ্যে কিভাবে বিধৃত আছে তার মানচিত্র উদ্ঘাটনের কাজটি এখন অনেক ব্যাপক ও দ্রুতগতিতে চলছে। আগামী বছর দশকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ ফসলের জন্য যে

রকম জিন বৈশিষ্ট্য আয়োজন তা কী এবং সে জিন কোন জীবের ডিএনএর কোন্ অংশে পাওয়া যায় তা আমাদের মোটামুটি জানা হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

একবার যদি আমরা প্রয়োজনীয় জিন ও তার উৎসকে চিনে ফেলি সেটি সংগ্রহ করে সংস্থাপন তেমন কঠিন কাজ নয়। এর জন্য বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে। অধিক ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া হলো উদ্ভিদে টিউমার সৃষ্টি করে এমন ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা। দেখা গেছে যে এটি উদ্ভিদে টিউমার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সেই টিউমারের মধ্যেও ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় না। এর কারণ হলো এই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে নিজের ডিএনও ঢুকে পড়ে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার ঐ আচরণটুকু উদ্ভিদটির নিজের আচরণে পরিণত হয়। ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আমাদের কাঙ্খিত নানা জিন উদ্ভিদের বংশগতিতে ঢুকিয়ে দেবার কাজে এই ব্যাকটেরিয়াকে সহজে ব্যবহার করতে পারছি। অবশ্য কোন কোন উদ্ভিদ এভাবে নতুন জিন গ্রহণ করতে চায় না। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রায় আক্ষরিক অর্থে গুলি করে এ জিন ঢোকানো যায়। তুলা, সয়াবিন, ভুট্টা এ সবকিছু ফসল এই শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে। এসব কঠিন ক্ষেত্রের জিন সংযোগ এখন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরপরও কাজের একটি ব্যাপক ক্ষেত্র থেকে যায়। সত্যিকার ফল লাভ করতে হলে প্রত্যেক ফসলের ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক গুণাগুণের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সর্বোত্তম পরিস্থিতি নির্ণয় করতে হবে। এ জন্য বহু কর্মীর বহু দিনের কাজ প্রয়োজন। এতে আমাদেরও অংশগ্রহণ করার বিষয় প্রচুর রয়েছে।

ডিএনএ পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে নানা কাজ করার রয়েছে। এভাবে উদ্ভিদের কাঙ্খিত জিন অন্য উদ্ভিদে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রাণীর জিনও উদ্ভিদে আনা যায়—যদিও সেটি অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। কোন রোগের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রাণী প্রাকৃতিকভাবে প্রতিরোধক বিষ তৈরি করে, তাহলে তার যথাযথ জিন উদ্ভিদে নিয়ে গিয়ে তাকেও অনুরূপ রোগের প্রতিরোধী করে তোলা যায়। আবার কখনো কখনো আমরা উদ্ভিদের মধ্যে নতুন জিন সংযোজন নয়, বরং তার কিছু জিন বাদ দিয়ে দিতে চাইবো। যেমন কফি থেকে ক্যাফেইন সৃষ্টির জিন বাদ দিলে সেটি আরো নিরাপদ পানীয় হবে।

জিন সংযোজিত বা বিয়োজিত নতুন ফসল বা অন্যান্য উদ্ভিদ উন্নয়নশীল দেশের কৃষকের হাতে পৌঁছতে দেরি হওয়া উচিত হবে না—কারণ প্রয়োজনের অনেকখানি তাদেরকে ঘিরেই। যেমন সম্প্রতি কীটনাশক গুণসম্পন্ন যে তুলার জাত জিন প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা হলে বাংলাদেশের তুলাচাষীও এই প্রযুক্তিতে জড়িত হয়ে পড়তে পারেন। তুলার ক্ষুদ্র রাসায়নিক কীটনাশক অংশ পরিবেশ দূষণকারী প্রমাণিত হওয়াতে এই নতুন জৈব প্রযুক্তি সেখানে পরিত্রাণকারীর ভূমিকা নিতে পারে। এমনিভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও জৈব প্রযুক্তির দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। জীবাণু সার, রোগমুক্ত টিশ্যু কালচার করা বীজ, অধিক পুষ্টি সম্পন্ন শস্য ইত্যাদি বিষয় এখনই প্রযুক্তিগতভাবে তৈরি রয়েছে এবং আমরা এগিয়ে আসার অপেক্ষায় আছে।

# সবুজের সংকেত

"নতুন ফর্মুলা—ক্লোরিন বিহীন"। "ফসফেট নেই, তাই পানি ও জলজ প্রাণীর পরিবেশ ভারসাম্যের সহায়ক"। কথাগুলা লেখা রয়েছে—নতুনভাবে বাজারে এসেছে এমন ডিটারজেন্ট সাবানের প্যাকেটে। তেমনি স্প্রে এরোসোলের একট কৌটোয় স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'ওজোন-নিরাপদ'। 'রেনো এখন সবুজগামী'—বড় বড় হরফে এই কথা কয়টি লেখা রয়েছে মোটরগাড়ির কোম্পানি রেনোর বিজ্ঞাপনী পোস্টারে। এতে আঁকা রয়েছে নতুন ধরনের ইঞ্জিনের ছবি।

এর কোনটিই এখনো আমাদের দেশের বাজারে আসেনি কিন্তু প্রবণতাটি স্পষ্ট। মানুষ এখন পরিবেশ সচেতন হচ্ছে, তাই পরিবেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সামগ্রীর চাহিদা রয়েছে। প্রতিযোগিতার বাজারে সামগ্রীর উৎপাদনকারী এবং বিজ্ঞাপনদাতার এই চাহিদাটির প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন। তাই ডিটারজেন্টকে ক্লোরিন বিহীন করতে হয়েছে জলজ ধোয়া পানি যে জলাশয়ে গড়াবে সেখানে ফসফেট সার বেড়ে অতিরিক্ত আলজি শ্যাওলা জমে পানি পচে না যেতে পারে। শুধু তাই নয়, মানুষকে জানতে হবে যে এই ডিটারজেন্টের উপর নির্ভর করা চলে পরিবেশের ব্যাপারে, তাই প্যাকেটের উপর সবিস্তারে লেখা।

এরোসোলে সি. এফ. সি. নামে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করাটাই ছিল এতদিন স্বাভাবিক। ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের এই সংক্ষিপ্ত নামটি এখন একটি অপরাধী বস্তু হিসাবেই সচেতন মহলে চিহ্নিত। এর অপরাধ হলো যে কয়টা গ্যাস ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে ওজোন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ফুটো করে দিতে পারে তাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে মোক্ষম। তাই এরোসলের প্রস্তুত কারক সি. এফ. সি. এর বিকল্প ব্যবহার করে কৌটার উপর বড় হরফে লিখে দিচ্ছে—'ওজোন নিরাপদ'। এরোসলের কৌটাটি যিনি ব্যবহার করছেন তাতে যদি সি. এফ. সি. থাকতোও তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি সরাসরি কিছুই ছিল না। ওজোন স্তর নষ্ট হবার ব্যাপারটি একটি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী ক্রিয়া। তবু সচেতন মনুষ জেনেশুনে সার্বিক পরিবেশের ক্ষতিকর কিছু আজ করতে নারাজ।

ফ্রান্সের বিখ্যাত গাড়ি উৎপাদনকারী কোম্পানি রেনো। তার শ্লোগান—রেনো এখন সবুজগামী। মোটরগাড়ির কোম্পানি সবুজ অভিগামী হবার কি অর্থ? সবুজ এখন উন্নত দেশসমূহে দূষণমুক্ত পরিবেশের প্রতীক। তাই পরিবেশকে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে সামনে নিয়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সেখানে গঠন করেছেন 'সবুজ দল'। পরিবেশ

দূষণকারী শক্তিধর গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যাঁরা সম্মুখ সমরে নেমেছেন তাঁরা হলেন সবুজ শান্তি সংগ্রামীরা। জনসাধারণের টান যেখানে সবুজের দিকে সেখানে মোটরগাড়ির দূষণসৃষ্টির প্রবণতা মানুষের বিরক্তি ভাজন হবেই। তাই গাড়ির কোম্পানিকেও পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে হচ্ছে, তা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে এবং সেটি মানুষকে জানাতে হচ্ছে। আপাতত আমাদের কাছে এগুলো দূরের খবর মনে হতে পারে। কিন্তু নগরজীবনে পরিবেশ দূষণের ভুক্তভোগীদের মধ্যে আমাদের অবস্থাই তো সবচেয়ে খারাপ। আধুনিকতার যেসব উপকরণে নগরের মানুষ একেবারে পরিবেষ্টিত তা তার কাজে লাগুক বা না লাগুক এর দূষণের প্রতিক্রিয়া থেকে কেউ মুক্ত নয়। এ সব উপকরণের অধিকাংশের উৎস যেখানে ছিল সেখানকার মানুষ চেতন হয়েছে, নিজেদেরকে বাঁচবার উপায় উদ্ভাবন করছেন। আমাদেরকেও বাঁচার চিন্তা করতে হবে, উপায়-উপকরণের খবর নিতে হবে বৈ-কি। কাজেই বিশ্বের কোথায় পরিবেশের দিক থেকে কি হচ্ছে সে খবর আমাদের জন্য মোটেই দূরের খবর নয়।

পাশ্চাত্যের সবুজ আন্দোলনের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পরিবেশ সচেতনতার জোয়ার থেকে সেখানে গড়ে উঠছে আশির দশকের গোড়া থেকে ভিন্ন সুরের শিল্প কারখানা যাকে সাধারণ্যে সবুজ শিল্প বলেই অভিহিত করা হয়। এ ধরনের শিল্পে আজ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ কাজ করছে। শতাব্দী শেষ হবার আগেই এই সংখ্যা ৩০ লক্ষে উন্নীত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সবুজ শিল্পের কাজ কি? মোটরগাড়িকে দূষণ গ্যাসের উৎস হতে না দেবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন থেকে শুরু করে আবর্জনা থেকে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য উদ্ধার পর্যন্ত সবই এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত—যা কিছু পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হবে। দেশের সরকারগুলো এ ধরনের শিল্পকে উৎসাহ যোগাচ্ছে কর-রেয়াত দিয়ে। সবুজ শিল্পগুলো তাদের সামগ্রীর গায়ে সগৌরবে লাগাচ্ছে সবুজ চিহ্ন। যেমন ধরা যাক সবুজ রেফ্রিজারেটরের কথা। জার্মান কোম্পানি এ. ই. জি. তার রেফ্রিজারেটরের গায়ে লিখে দেয় 'মাইনাস ৫০%'। পরিবেশ সচেতন ক্রেতা ঠিক জানেন এর অর্থ কি। রেফ্রিজারেটরে হিমায়ক গ্যাস হিসাবে সি. এফ. সি. সাধারণত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সবুজ রেফ্রিজারেটরে সি. এফ. সি.'র পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই মাইনাস ৫০%।

উৎপাদিত সামগ্রীগুলাতে সবুজ শিল্পের ছোঁয়া দিতে গিয়ে সামগ্রীর দাম বাড়তে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সামগ্রীর আপাত মানও কমে যেতে পারে। কাগজ শিল্পে কাগজকে সাদা করার ব্লিচিং এজেন্ট হিসাবে ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ক্লোরিনের বিরুদ্ধে পানি দূষণের অভিযোগ রয়েছে। সুইডেনের একটি কোম্পানি সম্প্রতি ক্লোরিনের বদলে পার অক্সাইড ব্যবহার করছে ব্লিচ হিসেবে। কিন্তু এতে কাগজ ভালভাবে সাদা হয় না একটু লালচে থেকে যায়। এখন ঐ কোম্পানির পদক্ষেপ লাভজনক হতে পারে একমাত্র যদি তারা পরিবেশের দিক খেয়াল রেখে কম সাদা কাগজকে মেনে নেয়। পরিবেশ সচেতন মানুষ এর জন্য মূল্য দিতে তৈরি আছে বলেই সবুজ শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদেরকেও কোন না কোনভাবে মূল্য দিতে হবে বৈ-কি।

# বিপর্যয়টির হোতা আমরাই

আজ পরিবেশ নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। সারা দুনিয়া জুড়ে মানুষ উপলব্ধি করছে ক্রমেই আমাদের পরিবেশ জীবনের প্রতিকূলে যাচ্ছে। আর এটাও আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিকূলে যাওয়ার কারণগুলো সৃষ্টি করছি আমরা নিজেরাই।

প্রকৃতির যে পরিবেশ তার সুস্থিতি সে নিজেই সৃষ্টি করে। ঐ সুস্থিতিকে আশ্রয় করেই জীবন সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সব সময় এ রকম ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছে পৃথিবীর প্রাণী আর উদ্ভিদকুল। সূর্য সকল শক্তির উৎস, জীবনের প্রধান নিয়ামক। কিন্তু এই সূর্যেরও সব কিরণকে বায়ুমণ্ডল আমাদের কাছে আসতে দেয় না। আলট্রা ভায়েলেটের মত ক্ষতিকর রশ্মিকে সে আগেই আটকিয়ে দেয়। আর দেয় বলে আমরা বেঁচে আছি। আবার যে রশ্মিকে বায়ুমণ্ডল আমাদের কাছে আসতে দেয়, তাকে ভূমির কাছে ধরে রাখতেও সাহায্য করে। যদি তা না করত তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাবে ভুগতাম।

বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আমরা ব্যবহার করি। যে হারে ব্যবহার করি তাতে সেটি ফুরিয়ে যাবার কথা। কিন্তু আমাদের পাশাপাশি থেকে উদ্ভিদ সেই অক্সিজেন ফিরিয়ে দেয়। যে প্রক্রিয়ায় দেয় তাও আবার আমাদের জীবন রক্ষায় অন্যভাবে সহায়ক হয়। সমস্ত প্রাণীকুলের খাদ্যের যে পরস্পর নির্ভরতা তার গোড়া কিন্তু উদ্ভিদের পাতায় খাদ্যের সংশ্লেষণ—সালোকসংশ্লেষণ। এতেই অক্সিজেনও ফেরত আসে, খাবারও আসে।

খাদ্যাভ্যাসে নানা প্রাণীর নানা রকম বলেই সবাই টিকে থাকে। আসলে সমস্ত জীব জগত যেন এর সকল সদস্যের টিকে থাকার ব্যাপারে এক যোগে কাজ করছে। এই সার্বজনীন টিকে থাকার জন্য অনেকের আত্মত্যাগও প্রয়োজন হয়। কোথাও কোন প্রাণী সংখ্যায় অতিরিক্ত বেড়ে গেলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তার রাশ টেনে দেয়। শুধু আজকের যুগেই নয়, আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রথম যখন জীবনের উন্মেষ ঘটছে, তখন সেই আদি জীবন সুযোগ করে দিয়েছে নতুন অন্য জীবনের, নতুন জীবনের জন্য অনুকূল ভূমি, বাতাস সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে সে।

এমনিভাবে চিরদিন জীবন জীবনের অনুকূলে কাজ করে এসেছে এই পৃথিবীতে। বাধ সেধেছে শুধু মানুষ। তার বিশেষ মস্তিষ্ক তাকে এমন একটি ক্ষমতা দিয়েছে যা জীব-বিবর্তনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য কোন প্রাণীর কখনো ছিল না। এ হলো প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা। এ ক্ষমতা মানুষকে প্রকৃতির সুস্থিতিকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ দিয়েছে, একে বিনষ্ট করার সুযোগও দিয়েছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের প্রায় সম্পূর্ণ সময়টায় মানুষের তুলনায় প্রকৃতি ছিল অনেক বড়। তাই সাময়িকভাবে, স্থানীয়ভাবে সুস্থিতিভাবে তার হাত পড়লেও তার প্রভাব বিশাল প্রকৃতিকে বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। দু'পা এগোলেই বা দু'দিন কাটালেই মানুষ আবার খুঁজে পেয়েছে চিরায়ত, অবিচলিত মহা-প্রকৃতিকে। কখনো মানুষ বুঝতেও পারেনি যে এর ক্ষতি সে করতে পারে এবং পরিণামে নিজের বুদ্ধিতে নিজের কবর সে রচনা করার ক্ষমতা রাখে।

এর সব উলট-পালট হতে শুরু করেছে এই মাত্র গত শ'তিনেক বছর ধরে। শিল্প বিপ্লব এবং তার পরবর্তী অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত উন্নয়ন-গতি মানুষকে দেখতে দেখতে তার পরিবেশ থেকে অমোঘভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। শুরুতে এর প্রভাব তেমন অনুভূত হয়নি। কিন্তু আমাদের কালে এসে এই বিচ্ছিন্নতা চরমে এসেছে। শিল্প বিপ্লব মানুষকে বড় করেছে, কিন্তু তার পরিবেশকে গুড়িয়ে দিয়েছে। শেষ অবধি লাভের খাতে যে কি থাকবে সেটি নিয়ে আশংকিত হচ্ছে সে আজ এতদিন পরে এসে। স্বপ্ন ভঙ্গের মত জেগে উঠে সে দেখছে যাকে এতদিন শুধু উন্নয়ন বলেই জেনেছে তার মধ্যে রয়েছে অপচয়, বিষময়তা, দূষণ এবং ধ্বংস।

এসব মানুষ আজ দেখতে পাচ্ছে তার আশপাশেই, তারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের মধ্যে। উন্নয়ন তার সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়িয়েছ, অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি করেছে অসংখ্য রকমের জিনিসের। আজ সভয়ে সে লক্ষ্য করছে এর মধ্যে অনেক কিছুই তার নিজের পরিবেশের জন্য নিরাপদ নয়। ডিটারজেন্ট সাবান, প্লাস্টিক, কীট নাশক, সার, দ্রাবক, জ্বালানি, রং, ওষুধ, এরোসল, খাদ্যের নানা সংযুক্তি— যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই দেখা যাচ্ছে আমরা যা সৃষ্টি করেছি, যা না হলে আমাদের চলছে না, তাই অলক্ষ্যে আমাদের জন্য সৃষ্ট করে চলেছে এক অগ্রহণযোগ্য ভবিষ্যৎ।

দ্রুতগতির উন্নয়ন দ্রুতগতিতে জ্বালানি পুড়তে উৎসাহিত করে। এখন আমরা বুঝছি আমাদের পোড়া সব জ্বালানি আমাদের জন্য একত্রিত করেছে কত বড় দুর্ভোগ। নিঃশ্বাসের বাতাস নষ্ট করে তাৎক্ষণিক পরিবেশ তো দূষিত করেছেই, অদূর ভবিষ্যতে এর ফল হতে যাচ্ছে আরো সাংঘাতিক—আমরা হারাবো আমাদের বাসস্থান, আমাদের জলবায়ু, বাঁচার অনুকূল পরিবেশ। বন কেটে বসত—ওতো আমাদের কথা, উন্নয়নের কথা। কিন্তু এখন বুঝি সেটি আমাদের কত বড় কাল হতে যাচ্ছে। নিজেদের বাড়ির কাছের বন কেটে উজাড় করার ফল পেতে আমাদের বেশি দেরি হচ্ছে না। তেমনি আমাজন উপত্যকার বিস্তীর্ণ বাদল বনের ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া আমাদেরকেও রেহাই দেবে না, অনেক দূরের ঘটনা হলেও। আমরা এখন শিউরে উঠে দেখেছি প্রতিদিন কেমন করে আমরা নষ্ট করছি আমাদের বাতাস, আমাদের পানি, আমাদের আবাস।

শিল্প বিপ্লব আমাদের দেশে সংঘটিত হয়নি, এর প্রত্যক্ষ সুফল আমরা ভোগ করিনি। গত তিন'শ বছরে সবার জন্য উন্নত জীবনের জন্য যে আশীর্বাদ এটি পাশ্চাত্যে এনে দিয়েছে, আমাদের কাছে এখনো তা সোনার হরিণ। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে আমাদের এই ভৌগোলিক পরিবেশে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে তার থেকে আমরা মুক্ত নই। আমাদের নিকট পরিবেশের দূষণ যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে আমাদেরকেই ব্যবস্থা নিতে হবে, আর তা এখনই। উন্নয়নের গতি আমাদের বাড়বে, বাড়তেই হবে। কিন্তু তা পরিবেশকে প্রকৃতির কাছ থেকে আরো দূরে নিয়ে গিয়ে নয়, প্রকৃতিকে ব্যবহার করেই করতে হবে। ঐ ভুল থেকে এখন করে আর কেউ পার পাবে না, একথা যেন আমরা না ভুলি।

# পরিবেশের জন্য আন্দোলন

পরিবেশের অবনতির অনেক কিছু রয়েছে যা আজ আর চোখে আঙুল দিয়ে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে যেসব নিদারণ ভবিষ্যৎবাণী নিত্য আমরা শুনছি তাও কোন আশ্বাস জাগায় না। কিন্তু এত সবের মধ্যেও আশার একটি নব দিগন্ত আমাদেরকে সজীব রাখে, সচেষ্ট রাখে। এই আশাটি সৃষ্টি হয়েছে আজকের বিশ্ব জোড়া পরিবেশ সচেতনতা থেকে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সচেতনতা ও উদ্যোগ এখন একটি গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে, অন্তত উন্নত বিশ্বের দেশে দেশে। সেই আন্দোলনের প্রভাব আমরা অনুভব করছি এবং এর মধ্যে আমাদের এই ভূগোলকে বাঁচার পরিবেশের জন্য আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

পরিবেশ সংরক্ষণের চেষ্টাটুকু এই আন্দোলনের মধ্যেই প্রথম দেখা যাচ্ছে এ কথা অবশ্য বলা যাবে না। যুগে যুগে এর ছোট-বড় প্রচেষ্টার কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আমাদের জানা মতে সচেষ্টভাবে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রথম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল প্রাচীন ইরাকের নিনেভা নগরে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মাধ্যমে। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডে দেশের ৩৭ মিলিয়ন একর ভূমির মধ্যে ৫ মিলিয়ন একর রাজকীয় আদেশে শিকার ক্ষেত্র হিসাবে বনাঞ্চল রূপে রক্ষিত ছিল। আরো আধুনিককালের দিকে যদি চলে আমি দেখি তরুণ ডারউইন এইচ এম এস বীগল জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন ১৮৫১ সালে এক জন প্রকৃতিবিদ হিসাবে। তার কিছু আগে পরে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধে রয়্যাল সোসাইটি, পাখি নিরাপত্তার রয়্যাল সোসাইটি এবং আরো পরে গ্রামীণ ইংল্যান্ডকে সংরক্ষণের কাউন্সিল। সে সময় এমনি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছিল শিল্পোন্নত দুনিয়ার দেশে দেশে। অবশ্য এটি ঠিক যে, সে কালের উদ্যোগগুলো প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল জ্ঞানী গুণী ও অবসর ভোগী শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। সাধারণ মানুষ এ নিয়ে খুব একটা ভাবিত কখনো ছিল না।

পরিবেশের ভাবনা সাধারণ মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হবার ঘটনা এই বর্তমান শতাব্দীতেই ঘটেছে। প্রধানত তিনটি বিভিন্ন আন্দোলনে এই সার্বিক সচেতনতা গুরুত্ব পেতে দেখা গেছে। শতাব্দীর একেবারে শুরুতে ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে মানুষ প্রথম উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন যে শিল্প বিপ্লব আর নগরী বিস্তার তার প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যগুলোকে গ্রাস করে মানুষের জীবনের অবমূল্যায়নের হুমকি দিচ্ছে, যদিও সেটি সেখানে উন্নতির স্বর্ণযুগ হিসাবেই চিহ্নিত ছিল। ডারউইন পরবর্তী প্রকৃতিবিদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাজে নিয়োজিত অগ্রবর্তীরা বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণাও ইতোমধ্যে মানুষকে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

দ্বিতীয় আন্দোলনটি আসে গত মহাযুদ্ধের পর পর, এই প্রথম সত্যিকারের আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে। এ সময় জাতিসংঘ গঠন করে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা আই. ইউ. পি. এন.। এফ. এ. ও.—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা নামে জাতিসংঘের নতুন প্রতিষ্ঠানকেও দেয়া হয় প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বকে খাদ্যের অভাব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টার কাজ। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বন্য প্রাণী তহবিলও এই আন্দোলনেরই অংশ ছিল।

তৃতীয় আন্দোলনটি আজকের আরো ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী সচেতনতা উদ্যোগকে ধারণ করছে। এটি শুরু হয়েছিল ষাটের দশকের শেষের দিকে এবং তারপর থেকে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। স্বাচ্ছন্দ্য যখন উন্নত বিশ্ব মোটামুটি সর্বসাধারণের করায়ত্ত হয়েছে,তখন তারা জীবনকে উপভোগ করার মত পরিবেশ চাইল। কিন্তু তাকিয়ে দেখল তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ লোপ পেতে চলেছে। টলটলে পানিতে সাঁতার কাটার, সমৃদ্ধ প্রকৃতিতে বিচরণ করার, মনের সুখে বাগান করার যোগ্য পরিবেশ নিজের দেশেতো নয়ই বহির্বিশ্বেও যে ক্রমে কঠিন হয়ে পড়েছে এ সত্য বহু মানুষের কাছে চাক্ষুষ হলো এখন। শুধু তাই নয়, কাছের ও দূরের পরিবেশের অবক্ষয়ের চরম নানা দৃষ্টান্ত মানুষকে রীতিমত শংকিতও করে তুলল।

১৯৬৭ সালে একটি মাত্র তৈলবাহী জাহাজ টোবর ক্যানিয়ন দুর্ঘটনাক্রমে ইংলিশ চ্যানেলে ছড়িয়ে দিল প্রায় ৯ লক্ষ ব্যারেল তেল। মাইলের পর মাইল তটরেখা পাখি আর বিশাল মৎস্য সম্পদ এই দূষণের শিকার হলো। এই জাতীয় ঘটনা দুর্ঘটনা উদ্বুদ্ধ করলো নতুন প্রজন্মের এক দল প্রকৃতিবিদ ও লেখককে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত রাসেল কারসনের 'মৌন বসন্ত' পুস্তকটি পাশ্চাত্য জগতের গণবিবেককে দারুণভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হলো। লেখিকা অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে বৃহৎ শিল্প আর কৃষি আয়োজন পরিবেশে যে দূষণ বয়ে নিয়ে এসেছে তা শুধু অসুন্দর ও অবাঞ্ছিতই নয়, বরং মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। প্রকৃতির কোটি বছরে গড়ে উঠা সাম্য কেমনভাবে ধূলিস্যাৎ হয়ে মানুষের মৌলিক মঙ্গলকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে তাও তিনি দেখিয়ে দিলেন।

মহাশূন্যে ভ্রমণ, চাঁদে পদার্পণ ইত্যাদি ঘটনা টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি দেখতে পেয়ে নিজের জীবনতরী এই ভূগোলটির সমস্ত ঐক্য ও সীমাবদ্ধতাটি সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল। পল এরলিখের 'জনসংখ্যা বোমা' এলভিন তোফলারের 'ভবিষ্যৎ বিপর্যয়' থিওডোর রোজাকের ব্যক্তি/গ্রহ, রালফ্, নাদের প্রমুখ আন্দোলনকারীর লেখা, বক্তৃতা ইত্যাদির অনেককেই স্পর্শ করতে সক্ষম হলো।

রাজনীতিবিদ এবং বিজ্ঞানীদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে নতুন চিন্তা নিয়ে এলেন কিছু কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ। অন্যরা যেখানে প্রবৃদ্ধি ও প্রগতির কোন সীমা

টানতে নারাজ, তাঁরা সেখানে বললেন সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের চাহিদারও কিছু সীমা অপরিহার্যভাবে এসে যায়। প্রকৃতির মূল ভারসাম্যকে সম্মান দেখিয়েই আমাদের এগোতে হবে। পরিবেশের দূষণ ও ধ্বংস, জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি যে সমস্যা নিয়ে আসছে তাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রযুক্তির প্রতি নতুন দৃষ্টি দিতে হবে। বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রের দিকে অধিকতর দৃষ্টিপাত, মহা-ব্যবস্থাপনার বদলে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতির প্রতিকূলে না গিয়ে যথাসম্ভব অনুকূলে থেকে উন্নয়নের ধারা রচনা—এসব কৌশল সেই প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়ক হবে।

এই চিন্তার আবাহন যাঁরা করেছেন তাঁদের একজন ছিলেন শুমাখার। 'ক্ষুদ্রই সুন্দর'—তাঁর এই বই প্রযুক্তি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলকের কাজ করেছে। উন্নয়নবিদের দৃষ্টি থাকুক সৃষ্ট সম্পদের দিকে নয় মানুষের দিকে—এটিই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করেছে।

আশির দশকে পাশ্চাত্যের জনতা পরিবেশের বিষয়ে এতখানি সচেতন ও উদ্যোগী হয়েছে যে তাদের অনেকেই এর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ইউরোপের দেশে দেশে এখন সবুজ দল রয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিরা এখন পার্লামেন্টে বসেছেন, দেশের নানাবিধ নীতিকে পরিবেশের সপক্ষে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু আমরাও বাঁচতে চাই, সুন্দরভাবেই বাঁচতে চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর দেশ রেখে যেতে চাই, ঐ দৃষ্টান্ত আমাদেরকেও অনুসরণ করতে হবে। পরিবেশের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে। এর জন্য চিন্তাকে রাখতে হবে বিশ্বজনীন, কাজ করতে হবে স্থানীয়ভাবে।

# চিপকো : তৃণমূলে প্রতিরোধ

পরিবেশ নিয়ে মানুষের কিছু ভাবনা বরাবরই ছিল। ইউরোপ যখন শিল্প বিপ্লবের তুঙ্গে তখন সেখানে দু'একজন সাবধান বাণী উল্লেখ করেছেন। তেমনি বুড়িগঙ্গার পারে অত্যন্ত ঘন বসতির অন্য রকম যে শিল্পনগরী একদিন গড়ে উঠেছিল সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার শোচনীয় পরিবেশ সমসাময়িক লেখকদের কোন কোন জনকে ব্যথিত করেছিল। আজকের পরিবেশ-সচেতনতার সঙ্গে পূর্বের এই সব বিচ্ছিন্ন ভাবনার তফাত হলো এর ব্যাপকতায়। আজ পরিবেশ সচেতনতা একটি আন্দোলনের আকারে এসেছে যেখানে তা শুধু ভাবনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, সম্মিলিত মানুষের বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপও ঘটেছে যাতে করে পরিবেশের অবক্ষয় আর বেশি গড়াতে না পারে। উন্নত দেশে এটি ঘটছে। একই সঙ্গে আমাদের জন্য খুশির কথা হলো আমাদের এই অঞ্চলেও গরিব মানুষের নিজস্ব তাগিদেও এমনি বলিষ্ঠ প্রতিরোধ ঘটেছে যা শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে আন্দোলনে।

পরিবেশ নিয়ে যদি কোন শব্দকোষ রচিত হয়, তাহলে সেখানে এই উপমহাদেশীয় একটি শব্দও স্থান পাবে অবশ্যই—তা হলো 'চিপকো'। শব্দটা হিন্দী, এর মানে হলো জড়িয়ে ধরা। ভারতের উত্তর প্রদেশের গ্রামে একটি ছোট্ট গ্রামীণ সমিতির সদস্যরা খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী একটি শক্তিশালী কোম্পানির ঠিকাদারকে গ্রাম থেকে গাছ কাটতে বাধা দিয়েছিল। বাধা দেয়ার উপায় ছিল গ্রামের মেয়েরা এক একটি গাছকে প্রসারিত দুই হাতে জড়িয়ে রাখবে—যাতে কাঠুরিয়ার কুড়াল গাছ স্পর্শ করতে না পারে।

সেদিন কোম্পানির লোক ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু সেদিন সে গ্রাম থেকে নয়। একই রকম প্রতিরোধের মুখে গাছ কাটা বন্ধ হয়েছিল ঐ এলাকার আরো গ্রামে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু কি কারণে এমন করে জেগে উঠেছিল গ্রামের অতি দরিদ্র সাধারণ কিছু মানুষ? এটি নিশ্চয়ই পরিবেশবাদী প্রচারণা শুনে বা প্রবন্ধ পড়ে নয়। বিশ্ব পরিবেশবাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার জন্যও নয়। নিতান্তই নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপায়-উপকরণের উপর হাত পড়তে দিতে অস্বীকৃতি থেকেই এই প্রতিরোধের জন্ম। ধনিকদের স্বার্থের কাছে তাদের জীবন পরিবেশ বলি

হতে হতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে বলেই তারা মরিয়া হয়ে গাছকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিল।

'চিপকো' বৃক্ষের ক্ষতি হতে দেব না এই পণ করে গাছকে জড়িয়ে ধরা থেকে যে শব্দ ক্রমে ক্রমে সেই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটি কিন্তু শেষ অবধি দেশ ও অঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্ব পরিবেশবাদীদের শব্দ ভাণ্ডারে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের যেই দিনগুলোতে ঠিকাদারের লোকদেরকে গাছ কাটা থেকে সফলভাবে বিরত করতে পেরেছিল গ্রামের যে মহিলারা তাদের কাঠকে কিন্তু সত্যি সত্যি গাছকে জড়িয়ে রাখতে হয়নি। তার সংকল্প ব্যক্ত করেই তারা বোঝাতে পেরেছিল তাদের দৃঢ়তার কথা—নিরস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল কাঠুরিয়ার নির্মম কুঠারকে। ঐ ঘটনাটিই পরে পরিণত হয়েছে একটি আন্দোলনের প্রতীকে।

পরবর্তীতে এই 'চিপকো' শুধু তাৎক্ষণিক বৃক্ষরক্ষায় নয় পরিবেশ চিন্তায় দেশে দেশে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকেও নাড়া দিয়ে গেছে। দরিদ্র দেশেও উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার ধারণার মধ্যে যে সম্পর্ক তার অনেকগুলো দ্বন্দ্ব নিরসনে সাহায্য করেছে চিপকোর মর্মবাণী।

১৯৭২ সালে পরিবেশ সম্পর্কে স্টকহোলম সম্মেলনে একটি কথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। তা হলো : 'দারিদ্র্যই সবচেয়ে বড় দূষণকারী'। যদিও এর বিশ বছর পর রিও ডে জেনেরিওতে ধরিত্রী সম্মেলনেও এই কথার রেশ শোনা গেছে সেখানে কিন্তু অধিকাংশ মানুষের প্রতিনিধিরা এ কথা ঐ অর্থে মেনে নেননি। চিপকো থেকে যে সচেতনতা ও প্রতিরোধের বিস্তৃতি ঘটেছে তা ইতোমধ্যে ভালভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, দরিদ্র মানুষ যদি একবার বুঝতে পারে পরিবেশের অবক্ষয় কোন্ দিকে চলেছে, সেই তখন হয়ে উঠতে পারে পরিবেশের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান এবং সফল রক্ষক। এর কারণ দরিদ্রই তার বাঁচা মরার জন্য তার নিকট পরিবেশে প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এই টুকুকে রক্ষা করতে না পারলে তার আর কোন অবলম্বনই থাকে না। শেষ অবধি তাই ধরিত্রীর পরিবেশকে যদি রক্ষা করতে হয়, উন্নয়নকে যদি সবার জন্য টেকসই করতে হয় তাহলে দরিদ্রের মধ্যেও ঐ জাগরণ, ঐ আন্দোলন সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই।

চিপকো আন্দোলন শুরুর সেই ছোট ঘটনাটির পর গত বিশ বছর ধরে এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। যারা সেদিনের ঐ ঘটনা ঘটিয়েছিল তারা হয়তো এ সবের খবরও রাখে না। কিন্তু আলোচনা বিশ্লেষণ যত বড় ক্যানভাসেই হোক না কেন—পরিবেশ রক্ষার বাস্তব যুদ্ধ কিন্তু সংঘটিত হয় মানুষের ছোট ছোট আবাসে, অত্যন্ত ঘরোয়া এবং স্থানীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে। আজ আমাদের দেশে এই দিকটিকে গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। পরিবেশের আন্দোলন আজ আসতে হবে তৃণমূল থেকে। সাধারণ মানুষকে আজ সচেতনতার এমন স্তরে নিয়ে যেতে হবে যেখানে থেকে তার নিকট পরিবেশের যে কোন অবক্ষয় তার বুকে কঠিন হয়ে বাজবে এবং তাকে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করবে।

# সনাতন ও উন্নত প্রযুক্তি

দুনিয়ার বুকে প্রযুক্তি এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এই পরিবর্তনের পেছনে একটি মূল নিয়ামক হলো পরিবেশ সচেতনতা। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থাপনের প্রবণতাই ঐ নিয়ামক। গুরুত্বের দিক থেকে এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। এই পরিবর্তনে মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে দ্রুত সামনে চলে আসছে কিছু নতুন বিকাশমান প্রযুক্তি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়োটেকনোলজী বা জৈব প্রযুক্তি, ইনফর্মেশন টেকনোলজী বা তথ্য প্রযুক্তি, শক্তি উৎসের এবং শক্তি ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা, অধিকাংশ কাজ ব্যবহারের নতুন বস্তু সম্ভার ইত্যাদি। প্রযুক্তি পরিবর্তনের এই ধারার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের অগ্রগতি বিস্ময়কর রকমের দ্রুত। একই সঙ্গে এগুলো খুবই দ্রুত সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি চলে যেতে পারছে এবং মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রেখেই এগিয়ে যাচ্ছে।

যদিও এটি সত্য যে শিল্প বিপ্লবের মত এবারও পরিবর্তনের বড় ধাক্কাটিই অনুভূত হচ্ছে পশ্চিম জগতেই, এবার কিন্তু পুরো ব্যাপারটিতেই এমন কিছু মাত্রা রয়েছে যার ব্যাপ্তি সারা বিশ্বে উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব নির্বিশেষে। শিল্প বিপ্লবের পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে এবার নতুন প্রযুক্তি সরাসরি জীবনের বহু ক্ষেত্রে চাহিদায় দ্রুত সাড়া দিতে পারছে যা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যাতায়াত, যোগাযোগ, শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে অথচ পৃথিবীর কাঁচামালের উপর, শক্তি উৎসের উপর, প্রকৃতির উপর সেভাবে বড় রকমের কোন দাবি করছে না। পরিবেশের প্রতি সজাগ এবং টেকসই হতে এ প্রযুক্তি বরং সহায়তাই করছে। অন্তত তেমন প্রবণতা এর মধ্যে সৃষ্টি করা সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী এই নতুন প্রযুক্তি প্রবণতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য চমৎকার কিছু সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অনবায়নযোগ্য সম্পদের ঢালাও ব্যবহার ও অপচয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যাদের না আছে সে ধরনের একটি অপচয়শীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দেবার মত পুঁজির জোর, না আছে এর ফলে যে

অনিবার্য পারিবেশিক অবক্ষয় তা সামলে নেবার ক্ষমতা। অন্যদিকে নতুন ও বিকাশমান প্রযুক্তিগুলোকে যদিও এর হাই টেকনোলজী নামের জন্য যতই ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে হোক না কেন এগুলো প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভাবনা এবার আমাদের অনেক কাছে এনে দিয়েছে। এর জন্য খুব বড় অংকের পুঁজি সঞ্চয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যেসব পূর্ব শর্ত রয়েছে সেই কুশলী শ্রমশক্তি, জীব-বৈচিত্র্য, শিক্ষা কর্ম উন্নয়নের মাধ্যমে প্রসারমান প্রযুক্তি চাহিদা সেগুলোর সম্ভাবনা আমাদের যথেষ্ট উজ্জ্বল।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য এখন সনাতন এবং নতুন প্রযুক্তির একটি সুষম মিশ্রণই কাম্য। সেই মিশ্রণে উচ্চ প্রযুক্তির স্থান মোটেই গৌণ হবে না। বরং যেখানে এটি যথাযথ হবে। উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার জন্য অধিক অনুকূল হবে উচ্চ প্রযুক্তির সেই শাখাকে যথাসম্ভব ব্যবহার করতে হবে। সম্পদের যে সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে পূর্বের শিল্প বিপ্লবে অংশ নিতে দেয়নি, এখনো দারুণভাবে পিছিয়ে রেখেছে তা আমাদেরকে কাটিয়ে উঠতে হবে নতুন প্রযুক্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে। এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে হবে আমাদের উন্নয়নের জন্য নতুন কর্মকৌশল। এর মধ্যে সমাজের প্রত্যেক পর্যায়ে নতুন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ, এতে অংশগ্রহণের চেষ্টা এবং এর মধ্যে নিজেদেরও উদ্ভাবনী শক্তিকে নানাভাবে কাজে লাগাবার প্রয়াস সৃষ্টি করতে হবে। ছোট ছোট গ্রামীণ উদ্যোগ থেকে শুরু করে বড় শিল্প আয়োজন সব ক্ষেত্রের জন্যই একে সত্য করে তোলাটা জরুরী। আর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার হলো নতুন ও বিকাশমান প্রযুক্তিসমূহের চর্চা, ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। সৌর ফটোভোল্টাইক বিদ্যুৎ, উপগ্রহ যোগাযোগ এবং কৃষিতে জৈব-প্রযুক্তির কৌশলের মত বিষয়গুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত ফলপ্রসূ না হবার কোন কারণ নেই। তবে এগুলো পল্লী জীবন থেকে, পল্লী জীবনের সনাতন প্রযুক্তির কাছ থেকে যদি আলাদা হয়ে থাকে, ওর সঙ্গে মিশ না খায় তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান না ঘটাতে পারলে পরিবেশ রক্ষা এবং নতুন প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণ দুটিই আমাদের জন্য দুরাশা হয়ে থাকবে। মহিলারাসহ গ্রামের দরিদ্র মানুষের আয় যদি বাড়ানো না যায় তাহলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ন্যূনতম আবহ, শিশু পুষ্টি ও শিক্ষার মত মানব উন্নয়নের মৌলিক নির্দেশিকাগুলো পূরণ সম্ভব হয়ে উঠে না। সকলের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র তরুণ এ মহিলাদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক কাজের সুযোগ এখানে জাদুর কাঠির মত কাজ করবে। উন্নত নতুন প্রযুক্তিকে অযথাযথ মনে না করে, বরং চেষ্টা করতে হবে বর্তমান সীমাবদ্ধতাসমূহ সত্ত্বেও কাজের মধ্য দিয়ে সুবিধা বঞ্চিত এসব মানুষকে উপার্জনের লক্ষ্যে এসব প্রযুক্তির মধ্যে নিয়ে আসার। শুধু সনাতন প্রযুক্তি দিয়ে যা সম্ভব হচ্ছে না সনাতন ও উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে তাই বাস্তবতার মুখ দেখতে পারে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে দেখা গেছে যে গ্রামের অশিক্ষিত মহিলারাও কাজের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পেরেছেন। বিশেষ করে সম্পদ সংরক্ষণ যেমন উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ ইত্যাদি জৈব সম্পদ রক্ষা, নতুন জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগমুক্ত বীজ, পরিবেশ অবক্ষয়হীন সার ও কীটনাশক ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এসব কাজ সৃষ্টি এখনই সম্ভব। এটি একই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষা, দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত করার সম্ভাবনা রাখে।

# বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে

পরিবেশ সম্পর্কে আজ বহু কথা শুনছি, প্রচুর আলোচনা হচ্ছে এ নিয়ে। অনেক সময় মনে হয় এত কথা, কিন্তু কাজ নেই? বিশ্বজোড়া পরিবেশের কথা ভাবলে এমন আক্ষেপের যুক্তি রয়েছে। নিজের দেশের কথা ভাবলে সে যুক্তি আরো প্রবল। কিন্তু পরিবেশ সচেতন উন্নত দেশগুলোর নিজ স্বার্থে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর বিচারে কিন্তু এমন আক্ষেপ করা চলে না। যেখানে সত্যিকার কাজ হচ্ছে প্রচুর যা সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ায় খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। ফ্রান্সে এখন শুধু পরিবেশের উন্নতির জন্য মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ০.৯ ভাগ ব্যয়িত হচ্ছে। এ নিয়ে সেখানে অনেক মর্মবেদনা—কারণ ফরাসীরা এদিক থেকে নিজেদেরকে একটি পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে মনে করছে। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আয়ের এই অংশ ব্যয় করেছে ২০ বছর আগেই, আর প্রতিবেশী জার্মানি এই অংকে পৌঁছে গেছে ১৯৯০ সালেই। সেই ফ্রান্সেরই আরো কিছু খবর জানা যাক।

পিছিয়ে পড়ার সচেতনতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশ যে আগামী কয়েক বছরে তা পুষিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেছে। সেখানে ২০০০ সালে পরিবেশ খাতে যে ব্যয় দাঁড়াবে তা হবে এর দশ বছর আগের ব্যয়ের দ্বিগুণ। মোট জাতীয় আয়ের ১.৯ শতাংশে না পৌঁছা পর্যন্ত এটি বেড়েই চলবে। এই অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে জল সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করতে, বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ করতে, পার্বত্য এলাকাকে রক্ষা করতে, শব্দ দূষণ কমাতে, শিল্পের বর্জ্য থেকে দূষণ রোধ করতে এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ জনন কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে। পরিবেশ খাতে এই ব্যয়ের প্রবণতা জড়িয়ে আছে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিলে এক হয়ে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯১ সালে শিল্প কারখানাগুলোর নবায়ন খাতে মোট যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে তার ১৮% ই ব্যয় হচ্ছে ক্ষতিকর বর্জ্য পরিবেশে যাওয়া বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে। পরিবেশ সচেতন উন্নত দেশগুলো এ রকম ব্যয়কে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা না করে বরং একে ভবিষ্যতের গ্যারান্টি হিসাবে বিবেচনা করছে। উন্নত দেশসমূহে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে এদের রাজনীতিতে, রাজনৈতিক শক্তিগুলোতে। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় পশ্চিম ইউরোপে। বিষয়টি এতই

গুরুত্ব পেয়েছে এখানে দেশে-দেশে পরিবেশবাদী রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটছে—যেগুলো সাধারণভাবে সবুজ দল বলে পরিচিত। আর সেসব দল নেহাৎ একটি আদর্শবাদী গোষ্ঠিই হয়ে থাকেনি রীতিমত একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। ১৯৮৯ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে সবুজ দল ২০ লক্ষ ভোট লাভ করে মোট ৯ জন ডেপুটি নির্বাচিত করে। ফ্রান্সের জাতীয় নির্বাচনে শতকরা দশ ভাগ ভোট গিয়েছে সবুজ দলের পক্ষে। ফলে এ সব দেশের অন্যান্য দলগুলোও পরিবেশের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে পারছে না। এই ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে, সরকারগুলোকে পরিবেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখতে হচ্ছে জনগণের কাছে। আদি পরিবেশবাদীদের একজন বলেছেন রাজনীতিবিদরা যে হারে সবুজ রং ধারণ করছেন তার বিপরীত নিজেকে এখন খুব ফিকা সবুজ মনে হয়, কারণ তাঁদের অনেক খুব ঘন সবুজে পরিণত হয়েছেন। জার্মানীতে এখন সবুজ দল কোয়ালিশন সরকারের একটি প্রধান শরিক দল।

সবুজ এখন বাজারেও একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কোন পণ্যের উপর সবুজ লেবেল লাগানো থাকলে বুঝতে হবে এর নির্মাণ পদ্ধতিকে পরিবেশ যথাযথ করে বিশেষভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। হয়তো বাচ্চার কাঁথার কাপড় কিনছেন—সেটি এমন হবে যে তাতে ক্লোরিন ব্লিচিং ব্যবহার করা হয়নি। সবুজ লেবেলের ব্যাটারীতে পারদ থাকে না, এরকম কাগজ হয় পুনরাবর্তিত কাগজ। এ ধরনের দৈনন্দিন পণ্য ব্যবহার করার সঙ্গে এক রকম সামাজিক প্রবণতা এ সব দেশে সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি অব্যহৃত বর্জ্য যাতে দূষণ বাড়াতে না পারে সে জন্য পাড়ায় পাড়ায় মানুষ নিজেরাই ফেলনা কাগজপত্র সংগ্রহ করে তার পুনরাবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। যে প্রচুর প্লাস্টিক বোতল পরিত্যক্ত হচ্ছে সেগুলো সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। পরিবেশ সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে এই বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে আধুনিক ফ্যাশনের মধ্যেও। তরুণ তরুণীরা তো বটেই আরো বয়স্কদের চেয়েও দেখা যাচ্ছে পরিবেশবাদী টি-শার্ট। পোশাক-পরিচ্ছদে সিনথেটিকের বদলে প্রাকৃতিক আঁশের ব্যবহারে প্রবণতা বাড়ছে; লিনেন, এমনকি পাটও স্থান পাচ্ছে তাতে। পরিবেশ সচেতনতার এই সামাজিক দিকটি অবহেলা করার মত নয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন প্রযুক্তি ও শিল্পে ক্ষেত্রে পরিবেশ সহায়ক পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছে, বেশ কিছুটা চাপও সৃষ্টি করেছে। নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুবিধার্থে। পাতলা ঝিল্লীর মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে বিপুল পরিমাণ পানিকে দ্রুত দোষমুক্ত করার একটি নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে স্পেনে। কলম উৎপাদনকারী একটি কোম্পানি সাড়ে আট কোটি টাকার মত খরচ করেছে শুধু কলমের নিবের গোল্ড প্লেটিং করতে যাতে বিষাক্ত সায়ানাইড ব্যবহার করতে না হয় সে পদ্ধতি বের করতে। একটি সুতা কলে ১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে শুধু এতে ব্যবহৃত পানির শোধনের জন্য।

কাজেই পরিবেশ নিয়ে শুধু কথাই হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। পরিবেশ সচেতনতা আজ দেশে দেশে সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণ নতুন এক অগ্রাধিকার যা প্রতিফলিত হচ্ছে

মানুষের চিন্তায়, পছন্দে, মতাদর্শে, অভ্যাসে এবং ত্যাগ স্বীকারে। স্বাভাবিকভাবে সেটি পুনপ্রতিফলিত হচ্ছে সেখানে সরকারি নীতিতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এবং ভবিষ্যতের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত আমরা এমন করে কথাকে কাজে পরিণত করার অবকাশ পাচ্ছি না। কিন্তু একটু ভাবলে দেখা যাবে যে দারিদ্রের বিরুদ্ধে ও পরিবেশ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আসলে এক ও অভিন্ন। যদি সেভাবে আমাদেরও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে শিখি তাহলে আমরাও আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে পিছিয়ে থাকব না।

# নগর মানে কোলাহল

নগর জীবনে পরিবেশ দূষণের একটি দিকে আমরা প্রায় সবাইকেই টেক্কা দিতে পারি— সেটি হলো শব্দ দূষণ। শব্দও যে দূষণের একটি হতে পারে সে কথা শুনতে অবাক লাগলেও, পরিবেশ বিনষ্টিতে এর অবদানও কম নয়। নগরবাসী যখন গ্রামে যায় তখন সবকিছু বড় বেশি শান্ত মনে হয়। বাস-ট্রাকের বিকট শব্দ যে মানুষটির ধর্তব্যের মধ্যে আসতো না ঘুঘুর চাপা ডাকও সে স্পষ্ট শুনতে পায়। ঘুঘু ডাকা নিঝুঝুম পল্লীর কথা তো এ জন্যই এসেছে। কিন্তু রাজপথের ধারে, কলেকারখানায় অথবা ব্যস্ত গলির কোলাহলের মধ্যে যাকে সারাক্ষণ কাটাতে হয় সে জানে শব্দ দূষণ কতখানি হতে পারে।

বায়ু দূষণ, পানি দূষণ কিংবা কঠিন দূষণ বস্তুর মত শব্দ দূষণ কোন বস্তুর আকারে আসে না, আসে শক্তির আকারে। শব্দ যখন সৃষ্টি হয় তা তরঙ্গাকারে এসে তখুনি বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু তার অভিঘাত ক্রমাগত পীড়িত করতে করতে আমাদের শরীর ও মনের যথেষ্ট ক্ষতি করে যায়। এই জন্যই মাত্রাতিরিক্ত এবং পীড়নকারী শব্দ মাত্রই পরিবেশ দূষণের একটি রূপ।

উচ্চ মাত্রায় শব্দের মধ্যে নিত্য বাস করে এটি কিছুটা সয়ে এলেও নগরবাসী মাত্রই জানে এখানকার সার্বক্ষণিক যাবতীয় কোলাহল কতখানি পীড়াদায়ক। আমাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এটি নানা রকম ক্ষতি করে চলছেই। অনেক দিন ধরে উচ্চ মাত্রার শব্দের মধ্যে থাকতে হলে কানের শ্রবণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। এভাবে নগরবাসীদের একটি বড় অংশ স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলছে। এ ছাড়া পীড়াদায়ক শব্দ মানুষের মানসিক স্থৈর্য, চিন্তার ক্ষমতা, বিশ্রাম, শান্তি নষ্ট করে। এটি ক্লান্তি এবং খিটখিটে স্বভাবের সৃষ্টি করে। দেখা গেছে পীড়াদায়ক শব্দের ক্রমাগত উপস্থিতিতে যে কোন ধরনের কাজের স্পৃহা এবং দক্ষতা হ্রাস পায়। এর কোনটিকেই কোনভাবে অবহেলা করা যায় না। প্রত্যক্ষ ক্ষতিগুলোর অন্তরালে গড়ে উঠতে থাকে আরো গুরুতর পরোক্ষ ক্ষতির ক্ষেত্র।

অস্থিরতা, উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা দুর্ঘটনা ঘটানোর প্রবণতা বাড়ায়। আবার পীড়াদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্ট এই উপসর্গগুলোই উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য রক্ত সঞ্চালন ও হার্টের অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের শ্রবণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে শব্দের যে দুটি দিক বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক তা হলো এর শক্তি এবং এর তীক্ষ্নতা। শব্দের মধ্যে শক্তি কতখানি রয়েছে তা নির্ধারণ করবে শব্দটি কত জোরালো হবে। আবার শব্দের তীক্ষ্নতা নির্ভর করে এর ফ্রিকোয়েন্সি অর্থাৎ পর্যাবৃত্তি হারের উপর। চাপা শব্দের পর্যাবৃত্তিহার কম, কিন্তু তীক্ষ্ন বা উচ্চগ্রামের শব্দের পর্যাবৃত্তিহার বেশি। পর্যাবৃত্তিহার মাপা হয় হার্সের এককে। মানুষের কান শুনতে পায় ২০ থেকে ১৮,০০০ হার্সের মধ্যে শব্দ। শব্দ কত জোরালো তা মাপা হয় ডেসিবেলের এককে। জেট বিমান উড্ডয়নের ঠিক আগে ১৪০ ডেসিবেরে মত শব্দ উৎপাদন করতে পারে। ব্যস্ত রাজপথের কোলাহলের জোর ৭০ ডেসিবেলেরও বেশি হতে পারে।

শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাসের কথা যখন আমরা বলছি সেটি দুরকমের হতে পারে। কত জোরে আসলে একটি শব্দ শ্রবণযোগ্য হবে সেই সীমাটি ক্রমে বড় হতে থাকলে এক রকমের বধিরতা দেখা দেয়। আবার যতখানি তীক্ষ্ন বা চাপা শব্দ স্বাভাবিকভাবে শোনার কথা তা না শুনতে পাওয়াও অন্য এক ধরনের বধিরতা। শব্দ কত পীড়াদায়ক হবে বা শ্রুতিমধুর হবে সেটি আবার নির্ভর করে এর মধ্যে কত রকমের পর্যাবৃত্তি হার রয়েছে, কোনটির শক্তি কতখানি ইত্যাদির সম্মিলিত গুণে। তা ছাড়া এ শব্দ আশপাশের দ্রব্যাদিতে কি রকম অনুরণন সৃষ্টি করছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিনা এ সব বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের নগরজীবনে শব্দ দূষণের উৎসগুলো কাউকে চিনিয়ে দিতে হবে না। রাজপথের যে যানবাহনগুলো বায়ু দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী—ট্রাক, বাস, টেম্পো, অটোরিকশা এবং গাড়ি শব্দ দূষণেও তাদের কৃতিত্বই সর্বাধিক। এ সবের পরিত্যক্ত গ্যাস নির্গমণের সময় শব্দ যাতে না সৃষ্টি হয় সে জন্য বিশেষ আকৃতির নল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটি ঠিক থাকে না, ইঞ্জিনের অবস্থাও হয় বেসামাল গর্জনশীল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হর্নের শব্দ। উন্নত দেশের শহরের গাড়ির হর্ন ব্যবহৃত হয় কালে ভদ্রে, বিশেষ পরিস্থিতে। আর আমাদের রাস্তায় হর্ন না বাজিয়ে একটি গাড়ি দু' মিনিটও চলতে পারে না। অনেক সময় হর্ন এক নাগাড়ে বাজতেই থাকে। আর হর্নের আওয়াজ যাতে প্রতিযোগী সব শব্দ ছাপিয়ে সোচ্চার হতে পারে সে জন্য এটি বিকট থেকে বিকটতর হচ্ছে। রাস্তার সকল গাড়ি যখন এই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে তখন শব্দ দূষণের জন্য আর কিছু প্রয়োজন আছে কি?

এর সঙ্গে কল-কারখানার শব্দ এবং মানুষের কোলাহল যখন যুক্ত হয় তখন নগরীর শব্দ দূষণ ষোলকলায় পূর্ণ হয়। শুধু গাড়ি চালাতে গিয়েই নয় বা অসচেতন পথচারী হিসাবেই নয় নগরীর আরো অনেক শব্দদূষণ সৃষ্টি হয় আমাদের দায়িত্বহীন স্বভাবের ফলে। যখন তখন যে কোন কারণে মাইক বাজিয়ে মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলতে আমাদের বিন্দুমাত্র বাধে না। এভাবে যা হবার কথা ছিল শ্রুতি মধুর সঙ্গীত তাকে আমরা পরিণত করি অনেকের জন্য অসহ্য কোলাহলে। অপরের প্রতি বিবেচনার অভাব

এক্ষেত্রে খুব প্রকট। শব্দ দূষণও যে অন্য সব দূষণের মতো জন স্বাস্থ্যের জন্য এবং সুস্থ নাগরিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর এই বোধটি বিস্তার লাভ করলে এমনটি হত না।

নগরজীবনে শব্দের কিছু উচ্চ মাত্রা অপরিহার্য হলেও একে অতিরিক্ত পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর না হতে দেবার উপায় রয়েছে বৈ-কি। যানবাহনগুলো অন্যান্য দূষণের মত শব্দ দূষণও যাতে না ঘটাতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া যেতে পারে। এ সম্পর্কিত আইনের কড়াকড়ি এবং তার প্রয়োগ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। কল-কারখানায় শব্দ কমানোর চেষ্টা যাতে থাকা দরকার তেমনি ইয়ার প্লাগ ইত্যাদি ব্যবহারে মাধ্যমের শ্রমিকদের রক্ষা করাটাও জরুরী। নগরীতে অপ্রয়োজনীয় কোলাহল যাতে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে সৃষ্টি সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রেও আইনের কড়াকড়ি প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সর্বজনীনভাবে পরিবেশ সচেতনতা—এর কোন বিকল্প নেই।

# সেই উদ্যান নগরী

সুদৃশ্য লনে অনেক সময় দেখা যায় ছোট্ট ফলক—"ঘাসে হাঁটা নিষেধ"। তেমনি একটি সাইন বোর্ড দেখেছিলাম বিদেশী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। তাতে লেখা "যদি এই ঘাসকে বাঁচতে দেয়া হয় তাহলে এটি আগামী পুরো সেমিস্টার দুজন ছাত্রের নিঃশ্বাস নেবার সমস্ত অক্সিজেন তৈরি করবে।" প্রতি নিঃশ্বাসে আমরা যে বাতাস টেনে নিই ফেরত দেবার সময় তার শতকরা ২৫ ভাগ অক্সিজেনকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে তারপর ফেরত দিই। এই মহানগরীকে নব্বই লক্ষ লোক প্রতি নিঃশ্বাসে যদি বাতাসের অক্সিজেনকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করতে থাকি তাহলে সে অক্সিজেন পুনরায় তৈরি করতে কি পরিমাণ ঘাস সবুজের প্রয়োজন হবে?

প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের যে ভারসাম্য আসে তা ব্যাহত হয়। এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সবুজ গাছপালার। সবুজ পাতা সূর্যের আলোর সাহায্যে যখন গাছের শর্করা খাবার তৈরি করে সেই কাজে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড সে টেনে নেয় আর ত্যাগ করে অক্সিজেন। এভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রাণীর জন্য অক্সিজেনের মাত্রা রক্ষা করে। নগরীর ইটপাথর আর অগুণতি মানুষ বসতের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ কতখানি আছে তার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে নগরীর বাতাসে স্বাস্থ্যকর পরিমাণ অক্সিজেন আছে কিনা সে মানুষের জন্য।

নগরীর সর্বত্র আবৃত মাটি, সেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মত ঘাসের অবকাশ এখানে বড় একটা নেই। যদিও বা একটু আধটু থাকে সে ঘাসও প্রায়শ মুড়ানো থাকে অসংখ্য পদচারণায়। কাজেই সত্যিকার অর্থে সবুজের জন্য এখানে গাছপালাই ভরসা—যারা আকাশে মেলে দিয়ে রাখে তাদের অক্সিজেনের কারখানা। ইতিহাসের ঢাকা নগরীতে গাছপালা কেমন ছিল সে কথা বড় একটা জানা নেই। তবে আন্দাজ করি বুড়িগঙ্গার পাড় ধরে স্বল্প প্রস্থের যে নগরীটি সেদিন গড়ে উঠেছিল তা জনবহুল হলেও বিস্তীর্ণ সবুজে ভরা পল্লী এর কোন অংশ থেকে তেমন দূরে ছিল না। পরে শহর যখন আয়তনে বেড়েছে তখনকার কথা অবশ্য ভিন্ন।

কিন্তু দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার পর কিছুটা আধুনিকতার পরশ দিয়ে রমনায় যেদিন প্রথম গড়ে উঠেছিল নতুন ঢাকা সেদিন এর পরিচয় হয়েছিল উদ্যান নগরী

হিসাবে। ঢাকার এই নতুন সাজের উপলক্ষ ছিল বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী নির্বাচিত হওয়াটা। ১৯০৮ সালে ইংল্যান্ডের বিশ্ব বিখ্যাত কিউ-গার্ডেনসের বিশেষজ্ঞ পাউডলককে নিয়ে আসা হয় এই শহরে তরুবীথি সন্নিবেশের দায়িত্ব দিয়ে। সেদিন যেভাবে তিনি রমনার উদ্যান নগরী রচনা করেছিলেন তার সবটুকু আজ সেভাবে নেই, রমনাতে আজ ঢাকার বিস্তীর্ণ নগরায়নের ঘন সংবদ্ধতার মধ্যে আত্মসমর্পিত। কিন্তু এখনো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনের রাস্তায় রাজশিরীষ বীথি, ফজলুল হক হলের পূর্ব পাশের মেহগিনি সারি, ফুলার রোডের জারুল সারি, জগন্নাথ হলের পেছনের তেলকুচোর বীথি, সলিমুল্লাহ হলের সামনে রেইনট্রির সমারোহ পউডলকের সেই মমতায় গড়া রমনাকে খানিকটা ধরে রেখেছে।

পরবর্তী সময়ে ঢাকার নতুন অংশে বৃক্ষ রোপণের যেসব পরিকল্পনা হয়েছে তাতে মোটের উপর প্রাউডলকের নীতিই অনুসৃত হয়েছে। যোগ হয়েছে রমনার কৃষ্ণচূড়া— চৈত্র বৈশাখে যার বর্ণচ্ছটা ঢাকাকে রাঙিয়ে তোলে। নতুন নতুন যোগ হয়েছে জারুল, এ্যাকাশিয়ার আরো পথতরু। স্থান বিশেষে বাগান বিলাশের পরিকল্পনা পরিবেশকে তুলেছে আরো মোহনীয় করে। পথতরু বিন্যাসের এমন পরিকল্পনা সর্বত্র সার্থক হয়নি এমন সমালোচনা অবশ্য আজকের উদ্যান বিশারদদের কেউ কেউ করছেন। বলেছেন লাইনের পর লাইন একই প্রজাতির দীর্ঘ সারি বৈচিত্র্যের অভাবে দৃষ্টিপীড়া ঘটায়। কৌণিক আকৃতির দীর্ঘকায় গাছের বৈচিত্র্য এদেশে না থাকলেও দেবদারু ও নাগেশ্বর দিয়ে এর প্রয়োজন মেটানো যেত—উঁচু দালানের সঙ্গে মানাতো ভাল; নাই বা হলো সাইপ্রেস বা পপলার। সমালোচনা রয়েছে বাংলার নিজস্ব ছাতিম, কামিনী, পলাশ, কনকচাঁপা, হিজল, অশোক, শিশু, আমলকী—এসবকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ঢাকার তরু নির্বাচনে একটি পরিবেশগত আপত্তিও রয়েছে। এর পুষ্প সমৃদ্ধ বৃক্ষগুলো থেকে ফুলের মৌসুমে প্রচুর পরাগ ছড়ায় যা এলার্জি কাতর মানুষের জন্য শ্বাসকষ্ট এনে দিতে সাহায্য করে। সে যাই হোক পরিবেশের প্রশ্নে কিন্তু তরুরাজিই ছিল এবং খানিকটা এখনো রয়েছে আমাদের নগরীর মুষ্টিমেয় ইতিবাচক দিকগুলোর একটি। বৃহত্তর নগর রচনার সঙ্গে সঙ্গে একে উদ্যান নগরী হিসেবে গড়ে তোলার একটি ঐতিহ্য আমাদের ছিল, উপমহাদেশের সেদিনকার বহু নগরী সম্বন্ধে যে কথা বলা যাবে না। কিন্তু এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে, নগরায়নের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সচেতনভাবে রক্ষা করে একে আরো এগিয়ে নিতে আমরা পেরেছি কি? আজ নগরবাসীর জন্য সুস্থ পরিবেশ রক্ষার কথা যখন আমরা বলছি তখন নগরের গাছপালাগুলোর কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এযে কেবল বাতাসকে আমাদের জন্য গ্রহণীয় করে তুলছে তাতো নয়। নগরের ইট পাথরের মধ্যে শ্যামলিমা স্নিগ্ধতার পরশ বুলানোর কাজটিও তো এই তরুরাজিরই। নগরায়নের নানা স্বার্থপরতায় বৃক্ষ নিধনের জন্য অজুহাতের অভাব হয় না, অতীতে এভাবে অনেক ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে। সে ক্ষতি পুষিয়ে ভবিষ্যতের আরো শ্যামল নগরী গড়ে তোলার পথে বড় পাথেয় হচ্ছে তরুর প্রতি মমত্ববোধ, পরিবেশের প্রতি সচেতনতা।

বিশ্বের বহু খ্যাতনামা নগরীর মানুষের কাছে তাদের প্রিয় নগরীর বড় টান তার তরুরাজির মধ্যে। আজ বার্লিনবাসীরা দেয়াল ভেঙে এক হয়েছে। সেই বিভক্ত নগরীর বহু মানুষের বহুদিনের স্বপ্ন ছিল কবে আবার তারা ইচ্ছে হলেই উন্টার ডেন লিনডেনের পথ ধরে হাঁটবে। 'লিনডেন বৃক্ষের তলা'—এই নামেই পরিচয় বার্লিনের সবচেয়ে প্রিয় রাজপথটির। অথবা ধরা যাক প্যারিসের স্যাঁজে লিজের কথা—প্যারিসবাসীর যা গর্ব। প্রশস্ত বুলেভার্ড—উদার ফুটপাত, এক সারি গাছ, তারপর অনেকখানি ঘাসের লন, তারপর আর এক সারি গাছ, তারপর মাঝখানে গাড়ির পথ। আমাদেরও হতে পারত, এখনো হতে পারে এমনি গর্ব করার মত তরু সুশোভিত পথ, নগরীর কথা উঠলেই যেগুলোর কথা মনে পড়বে। আর মনে পড়বে সে নগরীর রুচিবান সচেতন নাগরিকদের কথা।

# উচ্চ বায়ুস্তরের কথা

বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার নামে যে স্তর সেখানে ওজোন গ্যাসের উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা আজকাল খুব সচেতন হয়ে উঠেছি। মাটির উপরে আমাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে সেই সুদূর উচ্চ ওজোন গ্যাসের ঘনত্বে ঘাটতি আবিষ্কার হবার পর থেকেই যেন আমরা জানলাম ওজোন নামের গ্যাসটি সেখানে রয়েছে। এর বিষয়টি আমাদের কাছে যেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে সেটি এরকম। সূর্যের রশ্মিতে দৃশ্য ও অদৃশ্য পুরো বর্ণালীর নানা অংশই কম বেশি মেশানো থাকে। এর মধ্যে অদৃশ্য যেই আলট্রা ভায়োলেট সেটি জীবদেহের জন্য ক্ষতিকর। আলট্রা ভায়োলেটের মারাত্মক তীব্রতা ভূ-পৃষ্ঠে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারে না; কারণ ঐ ওজোন গ্যাসের স্তরে তার অনেকখানিই শোষিত হয়ে যায়। আজ ওজোন গ্যাস বিনষ্টির ফলে এই নিরাপত্তা আবরণটি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এটি ভয় পাওয়ার ব্যাপারই বটে। তবে ওজোনজনিত সমস্যার একটি অংশ মাত্র। স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে ওজোন গ্যাসের ঘনত্বহ্রাস আমাদের জলবায়ুকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

উচ্চাকাশে প্রেরিত বেলুনের পরিমাপে দেখা গেছে—গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া বায়ুমণ্ডলের নিম্নতর স্তর টপোস্ফেয়ার অধিকতর উষ্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর স্তর স্ট্র্যাটোস্ফয়ারের উষ্ণতা হ্রাস পাচ্ছে। এটি বিশ বছরের মধ্যে এক ডিগ্রী সেলসিয়াসের একটি এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ কমে গেছে--তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার শীতল হবার কারণে ভূমি থেকে আসা সিএফসি ইত্যাদি দূষণ গ্যাসের প্রভাবে ওজোন বিনষ্টি দ্রুততর হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বায়ু পরিচলনের প্রেক্ষিতে এটি একটি গুরুততর প্রভাব রাখছে।

সূর্যকিরণ উত্তপ্ত ভূমি ইনফ্রারেড তাপ তরঙ্গ বিকিরণ করে এবং তা নিম্ন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে নিচে ভূমির কাছেই থেকে যায়। এ কারণে বায়ুমণ্ডল ভূমির কাছে সবচেয়ে গরম এবং যত উপরে যাওয়া যায় বায়ু ততই শীতল থকে। কিন্তু প্রায় ১৫ কিলোমিটার উপরে উঠার পর স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারে গিয়ে নিচে গরম ও উপরে ঠাণ্ডা এ অবস্থা আর বজায় থাকে না বলে পরিচলন প্রক্রিয়া ওখানে গিয়ে আর থাকে না—নিম্ন বায়ুমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কিন্তু দূষণ প্রক্রিয়ার ফলে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার শীতল হয়ে গেলে বায়ু পরিচলন আর শুধু নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে না, উপরে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারেও বিস্তৃত হবে। যে আলট্রা ভায়োলেট এতদিন ওজোনে শোষিত হয়ে স্ট্যাটোস্ফেয়ারকে উষ্ণ করত, তা এখন আরো নিচে নেমে এসে টপোস্ফেয়ারকে গরম করবে। এভাবে ওজোন বিনষ্টির ফলে একদিকে স্ট্র্যাটোস্ফেয়ার যেমন আরো ঠাণ্ডা হবে, টপোস্ফেয়ার তেমনি আরো গরম হবে। আর এটি হবে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় যা যেটুকু ইতোমধ্যে ঘটছে তার অতিরিক্ত।

বায়ু পরিচলনের এই ঊর্ধ্ব বিস্তৃতি পৃথিবীর জলবায়ুর জন্য নানা রকম অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কা এখন যথেষ্ট বাস্তব হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে কম্পিউটার ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখা গেছে, দক্ষিণ মহাসাগরের শক্তিশালী বায়ু প্রবাহের ঘূর্ণি আন্টার্কটিকার উপরকার স্ট্র্যাটোস্ফেয়ারকে বাদবাকি বায়ুমণ্ডল থেকে একেবারে আলাদা করে দেবে। ফলে এখানে তুষারকণা ও পূর্ণ মেঘ এমনভাবে জমবে যা সূর্যকিরণের স্পর্শে আরো দক্ষভাবে ওজোন স্তর বিনষ্ট করতে লেগে যাবে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে যে ওজোন বিনষ্টি ঊর্ধ্বাকাশকে ঠাণ্ডা করবে, আর তা ঠাণ্ডা হলো বলে আরো ওজোন বিনষ্ট হবে। মানে চক্রাকারে ব্যাপারটির দ্রুত অবনতি ঘটার পথ খুলে যাবে। এটি সীমাহীনভাবে হতে থাকলে আমাদের কি উপায়?

এর একটি ফলশ্রুতি হতে পারে আন্টার্কটিকা অঞ্চলের শীতল আবহাওয়া আরো নিম্নতর অক্ষাংশের দিকে এগিয়ে আসা। দক্ষিণ গোলার্ধে একটি নতুন বরফ যুগের সৃষ্টির আভাস ইতোমধ্যেই দেয়া হচ্ছে।

আর এসবের প্রশ্ন উঠছে এমন কিছু ঘটনার কারণে যার অনেকখানে নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। আমাদের জীবনের স্টাইল ও শিল্পোন্নত বিশ্বের কিছু শিল্প স্বার্থের কারণে সিএফসি'র মত গ্যাস আকাশে যেতে না পারলে অবস্থার অবনতি ঘটতে পারত না। বিশ্বজুড়ে তাই সোচ্চার আওয়াজ উঠছে এমনিতরো দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে। আজ এসব ঘটনা আমাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছে—এমন ধারণা হতে পারে। কিন্তু বিপদ যখন আসে তার প্রথম শিকার হব আমরাই, আর বিপদে অসহায়ত্বও আমাদের বেশি। এর কারণে উৎস যদি আমরা নাও হই, তাও।

# পরিবেশের বিশ্বায়ন

পরিবেশ ও নগর জীবনের এই আলোচনায় আমরা নিজেদের পরিবেশের অবস্থার কাছে থেকে দেখার চেষ্টাটিই বেশি করে করেছি। দেখিয়েছি অধিকাংশ সমস্যাই ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। কিন্তু একটি বিষয় বরাবরই প্রচ্ছন্ন ছিল তা হলো আমাদের লোকালয়টি কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন কোন লোকালয় নয়। এর পরিবেশ বিশ্বের একটি মাত্র সামগ্রিক পরিবেশের অংশ বৈ কিছু নয়। প্রযুক্তি সেই বিশ্বকে এখন ছোট করে ফেলেছে। কোন জায়গাই এখন আমাদের কাছ থেকে দূর নয়, আর এর ভাল-মন্দ কোন প্রভাব থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের পরিবেশ গড়া এখন দুরাশা।

সেই বিশ্ব-লোকালয়ের পরিবেশে এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? শংকিত হবার মত ঘটনা এখানে বড় বেশি নয় কি?

বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারের সম্মুখীন। প্রতি মিনিটে পাঁচ বছরের কম বয়সী ২৮ জন শিশু শুধু অপুষ্টি এবং পরিবেশ দূষণগত কারণে এখানে মারা যাচ্ছে। মানুষের অপব্যবহারের ফলে পৃথিবীর স্থল ভাগের এক-তৃতীয়াংশ আবাদী জমি মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। পৃথিবীতে গড়ে প্রতি হেক্টরে ৮ মেট্রিক টন মূল্যবান মাটি উপরতল থেকে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে, আর এর জায়গায় নতুন মাটি আসছে মাত্র ৫ মেট্রিক টন। এই স্থায়ী অবক্ষয় কৃতির পরিবেশ দিন দিন নষ্ট করে ফেলছে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বের মৎস্য ক্ষেত্রগুলো প্রধানত মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণের ফলে নষ্ট হয়ে চলছে। একদিন যেখানে দুনিয়ার নানা অঞ্চলের মানুষ বহুরকম খাদ্য শস্যের উপর নির্ভর করতো আজ সেখানে ধান, গম এবং ভুট্টার মত কয়েকটি মাত্র ফসলের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা দেখা দিয়েছে। ফলে শস্যের রোগ-ব্যাধি, পারিবেশিক প্রতিকূলতা অতি সহজে অসংখ্য মানুষকে দুর্ভিক্ষের দ্বারস্থ করতে পারছে।

কৃষি উপাদান এখন অতিমাত্রায় জ্বালানি নির্ভর। তেল, রাসায়নিক শিল্প, পুঁজি ইত্যাদির মত অনিশ্চয়তা সব নিয়ামকের উপর এর নির্ভরশীলতা কৃষিকেই অত্যন্ত অনিশ্চিত করে তুলছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা এখন পৃথিবীর সহন ক্ষমতার বাইরে চলে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ১৯৫০ সালে যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৫২ কোটি, ১৯৮০ সালে সেটি ছিল ৪৪৩ কোটি। চল্লিশ বছরেও কম সময়ে এটি আবার দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এদের বহন করার মত সম্পদ পৃথিবীর আছে কি?

৩০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে যে কয়লা, তেল ও গ্যাস জমা হয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশি আমরা নিঃশেষ করেছি গত মাত্র ২৫০ বছরের আমাদের উন্নয়নের জ্বালানি হিসাবে। বাকি যা আছে তার আহরণ অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং অনেক বেশি জ্বালানি সাপেক্ষ। খরচ যে হারে বাড়ছে, তাতে এতে চলবে হাতে গোনা কিছু বছর মাত্র। এক সময় মনে করা হয়েছিল—পারমাণবিক শক্তিই এনে দেবে সেই সস্তা, নিরাপদ এবং অফুরন্ত শক্তির উৎস। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটি এর কোনটিই নয়। নিরাপদ যে নয়, যে ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে বলার অপেক্ষা এখন রাখে না।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গাগুলোতে ঘন বাদল বনের একটি সমারোহ সারা দুনিয়ার প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সুন্দর অবদান রাখতে পারত। এখন সেটি বলতে গেলে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবার পথে। ১৯৫০ সালের পর থেকে ল্যাটিন আমেরিকার বাদল-বন নষ্ট হয়েছে ৩৫%, মধ্য আমেরিকার ৬৬%, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৩৮% এবং মধ্য আফ্রিকায় ৫২%। এটি যে শুধু কিছু বনাঞ্চলের অবলুপ্তি তাই নয়। এর সঙ্গে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে উদ্ভিদ আর প্রাণী বংশগতির কোটি কোটি বছর ধরে গড়ে উঠা এক সমৃদ্ধ জিন ভাণ্ডার। উদ্ভিদ আর প্রাণী বৈচিত্র্যের অর্ধেকের মত প্রজাতি এখানে ছিল। এদের অনেকগুলো এখন বিলুপ্তির পথে।

বনাঞ্চল ধ্বংসের পেছনে উন্নয়নের অজুহাত রয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষার নামে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের যে পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে শক্তিমানের বিশ্ব ধ্বংসের আয়োজন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ। জমা যে অস্ত্র আছে তাতে বিশ্বকে কয়েকবার ধ্বংস করা সম্ভব। যদিও খুব সাবধানেই জমা করা হয়েছে, তবুও ভাণ্ডার এত বিশাল যে দুর্ঘটনাবশত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এখন প্রচুর।

বিশ্বের সর্বত্র নানাভাবে পরিবেশকে এক অনিবার্য করুণ পরিণতির দিকে আমরা ঠেলে দিচ্ছি এ সত্য এখন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সারা দুনিয়ার সব মানুষের সুন্দরভাবে বাঁচার মত সম্পদ এখানে নেই, প্রযুক্তির উৎকর্ষ নেই এমন কথা কেউ বলবে না। যা নেই তা হলো এই সম্পদ, এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ ভারসাম্যের। তাই সম্পদ আর মেধা নিয়োজিত হচ্ছে অস্ত্রসজ্জায়। আর অন্যদিকে বিশাল জনগোষ্ঠী সম্মুখীন হচ্ছে দুর্ভিক্ষের, অপুষ্টির, রোগ-ব্যাধির। কারো সমস্যা হচ্ছে সীমাহীন চাহিদার, ভোগের আবার অন্যদের সমস্যা হচ্ছে নিদারুণ অভাবের। ভারসাম্যহীন এই মানব কর্মকাণ্ডে আমরা যে শেষ বিচারে নিজেদের আবাস, নিজেদের জীবনতরী এই ভূগোলকটিকেই চিরতরে নষ্ট করে ফেলছি এই সচেতনতাই একমাত্র আমাদের রক্ষা করতে পারে। আশার কথা এই সচেতনতা আজ দেখা দিচ্ছে দুনিয়ার দেশে দেশে।

ISBN 984-458-304-7

9 789844 583047

www.somoy.com